**This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.**

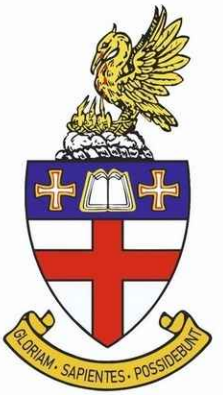

**This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.**

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

শ্রীরামপুর কলেজের

বাংলা গদ্য পুঁথি

সুরথমেধসীয় সম্বাদ ও অন্যান্য

সম্পাদনা

শ্রী প্রণব কুমার দেব

শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা গদ্য পুঁথি ঃ

সুরথমেধসীয় সম্বাদ ও অন্যান্য

সম্পাদনা
প্রণব কুমার দেব

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বাস বুক স্টল
৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা গদ্য পুঁথি
সুরথমেধসীয় সম্বাদ ও অন্যান্য।
সম্পাদনা : প্রণব কুমার দেব।

Early Bengali Prose Manuscripts
of Serampore College : Suratha -
Medhasiya Sambad and others.
Edited by : Pranab Kumar Deb.

প্রকাশক :
প্রণব কুমার দেব
কোন্নগর, হুগলী।

প্রথম প্রকাশ :- জুলাই, ১৯৯৫
গ্রন্থস্বত্ব- প্রণব কুমার দেব
মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র।

লেজার প্রিন্টিং
অরূপ কুমার দাস
স্যাপ ইম্প্রেসান
১৬, রাজা কে. এল. গোস্বামী স্ট্রীট
শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রচ্ছদ : শ্রী শ্যামল কুমার রায়

মুদ্রক : লক্ষ্মী ইম্প্রেশান্,
৩৩ডি মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

— শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেব

মাতৃদেবীর করকমলে।

সূচীপত্র

ভূমিকা .....পৃঃ i-vi

মুখবন্ধ .....পৃঃ vii-viii

পুঁথির আলোচনা .....পৃঃ ১-৬৫

সুরথমেধসীয় সম্বাদ গদ্যপুঁথি .....পৃঃ ৬৬-৯৪

পুঁথিটির সংক্ষিপ্ত ইংরাজী
অনুবাদ – উইলিয়াম ওয়ার্ড .....পৃঃ ৯৫-১০১

উল্লেখসূচী ..... পৃঃ i-ii

॥ সুরথমেধসীয়সম্বাদ ॥

পূর্ব্বে জৈমিনি মুনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকটে গমন করিয়া কহিলেন
মহাশয় তোমার নিকটে আমি ধর্ম্ম প্রস্তাব শ্রবণ করিতে আ-
সিয়াছি। বনে সুরথ রাজার সহিত মেধস মুনির যে কথোপ-
কথন হইয়াছিল সেই কথোপকথন আমি শ্রবণ করিতে
আসিয়াছি তাহা মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আজ্ঞা কর। পরে
জৈমিনিকে মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন এইক্ষণে আমার কথার
সময় নয় কিন্তু তপস্যার সময়। অতএব আমি যে সময়ে আ-
ঙ্গুরী মুনিকে বিন্ধ্যাচলে ঐ কথা শ্রবণ করাই তৎকালে চারি
পক্ষি সেই স্থানে ছিল তাহারা শ্রবণ করিয়াছে তাহাদিগকে বল
তাহারা তোমাকে শ্রবণ করাইবেক। এই কথা শুনিয়া জৈমিনি চারি
পক্ষির নিকটে গিয়া তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা মার্কণ্ডেয় মু-
নির স্থানে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহা আমাকে শ্রবণ করায়।
পক্ষিরা কহিতেছে শ্রবণ কর॥ মার্কণ্ডেয় যাহা কহিয়াছেন। সূর্য্যে-
র পুত্র সাবর্ণি নাম ছায়ার গর্ভজাত যাঁহাকে অষ্টম মনু বলিয়া
কহে তাহার উৎপত্তি কহিতেছি মহামায়ার অনুগ্রহ হইতে যে
প্রকারে সেই সাবর্ণি অষ্টম মন্বন্তরাধিপ হইয়াছেন তাহা আ-
মা হইতে শ্রবণ করহ। পূর্ব্বে দ্বিতীয় মন্বন্তরে চৈত্রবংশোদ্ভব
সুরথ নামে সমস্ত ভূমণ্ডলের একরাজা। ছিলেন। তিনি ঔরস
পুত্রের ন্যায় প্রজা প্রতিপালন শাস্ত্রানুসারে করিতেন।
কথোক দিবসের পর শূকর ধ্বংসী কথোক লোকেরা সেই রা-
জার শত্রুতা আচরণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব সেই
সকল লোকের সহিত অতিপ্রবল তরবল শালি সেই রাজার
যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল শূকর যাদক কর্ত্তৃক অল্প রাজা
পরাজিত হইয়া আপন নগরে আসিয়া নিজ দেশের কর্ত্তা হই-
য়াছিল। তাহার পর সেই প্রবল শত্রুরা রাজার পুরে আসিয়া
এই রাজাকে আক্রমণ করিয়া রাজার দুষ্ট অমাত্যদের সহিত

দনবলদুরস্থা।

সুরথমেধসীয় সম্বাদের একটি পৃষ্ঠা

।। ভূমিকা ।।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে লন্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি অখ্রীস্টান দেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন। উক্ত সংঘের সমস্ত সদস্যের ধারণা ছিল যে,খ্রীস্টধর্মপ্রভাবিত অঞ্চলের বাইরে যে বিস্তীর্ণ প্রায় অপরিচিত ভূভাগ পড়ে আছে, সেখানে বাস করে বন্য-বর্বর-হীদেন মানুষ যারা সদ্ধর্মের আলো থেকে বঞ্চিত। তাদের মানসিক জড়ত্ব দূর করে খ্রীস্টধর্মের সাহায্যে মুক্তির আলো দেখাবার অভিপ্রায়ে ১৭৯২ খ্রী:অব্দে লন্ডন শহরের ৭২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কেটারিং শহরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় কীভাবে অখ্রীস্টান দেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা যায় তার জন্য নানা আলোচনা চলছিল। উইলিয়াম কেরীও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সোসাইটির সমসাময়িক কালে চার্চ মিশনারি সোসাইটি (১৭৯৯), লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (১৭৯৫), কাল্‌প্‌হাম সেক্ট্ (Calpham Sect) এবং ওয়েসলিয়ান মিশনারি সোসাইটির (১৮১৩) সদস্যেরা ভারতে মিশনারি পাঠাবার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন – " to evengelise the poor dark, idolatrous, heathen, by sending missionaries in different parts of the world not blessed with the glorious light of the Gospel." জাহাজের ডাক্তার টমাস ও কেরীর উপর বাংলাদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ভার দেওয়া হয়, এবং ১৭৯৩ খ্রী:অব্দের ১৩ জুন কেরী ও টমাস সপরিবারে ব্রিটিশ জাহাজযোগে বার-দরিয়ায় বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু নানা কারণে উক্ত জাহাজ ত্যাগ করে ''প্রিন্সেস মারিয়া'' ডেনিশ জাহাজ যোগে ঐ বছরের ১১ নভেম্বর পূর্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন,এবং প্রায় পাঁচমাস পরে কলকাতায় অবতরণ করলেন। তারপর তাঁদের উপর দিয়ে দুর্ভাগ্যের কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেল। ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁদের যে অবর্ণনীয় দু:খ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তার ইতিহাস বড়ো মর্মন্তুদ। তারপর একটু আশার আলো দেখা গেল, ১৮০০ সালে দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে তাঁরা আশ্রয় পেলেন (১০ জানুয়ারি) এবং এখানে ভাগীরথী তীরে মিশন স্থাপন করলেন, স্থাপন করলেন একটি স্বল্পদামের মুদ্রাযন্ত্র। সেই যন্ত্র থেকেই বাইবেলের একাধিক অনুবাদ, ব্যাকরণ - অভিধান, রামায়ণ - মহাভারত, মাসিক (দিগ্‌দর্শন) ও সাপ্তাহিক পত্রিকা (সমাচার দর্পণ) প্রকাশিত হল। বিনামূল্যে বাইবেল বিতরিত হতে লাগল, মুদ্রিত গ্রন্থ হাতে পেয়ে গ্রাম্য জনসাধারণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, কারণ তার পূর্বে কোন মুদ্রিত গ্রন্থ গ্রামে গঞ্জে পৌঁছায়নি। দু-চারজন কৃষক শ্রেণীর ব্যক্তি

খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগল, কদাচিৎ ব্রাহ্মণ-কায়স্থও নিজধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করল। শ্রীরামপুরের তিন মিশনারি (কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড) কাছাকাছি গ্রামে বাইবেল বিতরণ ও খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মূলধন ছিল পৌত্তলিক হিন্দুধর্মবিদ্বেষ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পন্ডিতদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁরা অনেক সময়ে বেকায়দায় পড়তেন। প্রথমত, তাঁদের অনেকেরই খ্রীস্টান ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগত দিকটি ততটা জানা ছিল না, এবং জানা ছিল না বলেই রামমোহন রায় ত্রিত্ববাদী ধর্মযাজকদের কোণঠাসা করতে পেরেছিলেন। বস্তুত: হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষায় লেখা Old Testament ও New Testament- এর এমন অনেক দার্শনিক কথা রামমোহনের আয়ত্তে এসেছিল যে, তিনি শুধু 'জবরদস্ত্ মৌলভি' ছিলেন না, যে -কোনো Arch - deacon -কে দ্বৈরথেও আহ্বান করতে পারতেন। সেদিক থেকে বিচার করলে কেরী ও তাঁর ভ্রাতৃসংঘকে তর্ক-বিতর্ক ও তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট সুসজ্জিত মনে হয় না। সে যাই হোক, শ্রীরামপুর মিশনের কাছে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান বিশেষভাবে ঋণী। বিশেষত কেরীর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, বাংলা ও ইংরাজি অভিধান ('A Dictionary of the Bengalee Language'), বাংলা ব্যাকরণ ('A Grammar of the Bengalee Language') বাঙালি শিক্ষার্থীকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এসব তো বাইরের কথা। খ্রীস্টধর্ম প্রচার তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মূল মন্ত্র, তা তাঁরা কখনোই ভোলেননি। অন্তরে অন্তরে হিন্দুধর্ম, আচার-আচরণ, পূজাপদ্ধতি, সবকিছুকেই ঘৃণা করতেন। উদারমতি কেরীও বিশ্বাস করতেন, "They are in general poor, barbarous, naked pagans, as destitute of civilization, as they are of true religion." (দ্রষ্টব্য: কেরীর "An Enquiry to the obligation of the Christians", p.64.) মার্শম্যান রাখা-ঢাকা না রেখেই বলেছেন, "The pretended Gods they worship are monsters of vice, how can their worshippers be otherwise ?" ওয়ার্ড দু'খন্ডে যে বিশাল গ্রন্থ লিখেছিলেন ("A View of the History, Literature, and Religion of the Hindoos, including a minute description of their manners and custom and translations from their principal Works"), তার পিছনে ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষ সহায়তা, এবং আরো একাধিক পন্ডিতের আনুকূল্য, যদিও তিনি সকলের নাম উল্লেখ করেননি। এদেশীয় হিন্দু জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অশ্রদ্ধার যোগ্য – "For slander and abuse they stand unrivalled even amongst the most degraded of mankind." মুসলমান সম্প্রদায়কেও তিনি কুৎসিত ভাষায়

আক্রমণ করেছিলেন, যা মুদ্রিত করলে একালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাবে। হিন্দু শাস্ত্র কাব্য-মহাকাব্যাদির অনুবাদে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ভারতবাসীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রকাশের জন্য নয়। হিন্দুদের গ্রন্থাদি সব অসার, তাদের ধর্মমত কত বর্বর – সেটি প্রমাণের জন্যই তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী (যথা - হলহেড, উইলকিন্‌স, উইলিয়াম জোন্‌স, কোলব্রুক, প্রিন্সেপ ইত্যাদি। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশকে যথার্থই ভালবেসে ও শ্রদ্ধা করে এদেশের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাস অনুসন্ধান করেছিলেন, কেউ বা মনেপ্রাণে হিন্দু বনে গিয়েছিলেন (যেমন, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, যিনি ''হিন্দু স্টুয়ার্ট'' নামে পরিচিত হয়েছিলেন, হিন্দুর মতোই গঙ্গাস্নান করতেন, পূজাপাঠ করতেন), খ্রীস্টান ধর্মে হলহেডের বিশেষ আস্থা ছিল না, বরং তিনি এক ব্রাহ্মণের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন, বোধহয় তাঁর সান্নিধ্যে এসে হিন্দুর রহস্যবাদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। লন্ডনে ফিরে এই ধরণের মতামত প্রকাশ করায় সেখানে লোকে তাঁকে পাগল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, নানাভাবে অপদস্থ করে। এই অপরাধে তিনি পার্লামেন্টের পদটিও হারান (দ্রঃ E. B. Impey – ' Memoirs of Sir Elijay Impey ')। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উড্রফ প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং অটলবিহারী ঘোষের সহায়তায় তন্ত্রশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানসংগ্রহ করেন, বহু তন্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করেন, শোনা যায় তিনি নাকি হিন্দুর মতোই ব্যক্তিগত জীবন যাপন করতেন। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য ভারততাত্ত্বিক (অর্থাৎ Indologist) ইংরেজ পন্ডিতদের সঙ্গে প্রটেস্টান্ট মিশনারিদের মৌলিক প্রভেদ ছিল, সেটি প্রমাণ করা। ভারতের সংস্কৃতির প্রতি ভারততাত্ত্বিকদের ছিল শ্রদ্ধা, মিশনারিদের ছিল উপেক্ষা, অসহিষ্ণুতা, কখনো কখনো তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ। যে -কেরী সাহেবকে 'মহাত্মা' ও'Good Samaritan' বলা হয়েছে, তিনিও সে মনোভাবের উর্ধ্বে ছিলেন না। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে মিশনারিসুলভ কিছু সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা থাকলেও কেরী কিন্তু সংস্কৃত, বাংলা এবং বাঙালি পন্ডিত ও সাধারণ বাঙালির প্রতি শেষ জীবনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বোধহয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মতের কিছু পরিবর্তন হয়। এ দেশকেই তিনি নিজের দেশ বলে মনে করেছিলেন, কোনদিন ইংল্যান্ডে ফিরে যাননি, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান নানা প্রয়োজনে 'হোমে' গিয়েছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের সহায়তায় মিশনারিরা সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেন, এবং নিজেদের মতো করে সেগুলি ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা

করতেন, অনেক সময়েই হিন্দুর আচার আচরণ, দেবতত্ত্ব প্রভৃতির কঠোর নিন্দা করতেন। ওয়ার্ড যখন দু'খন্ডে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন একাধিক ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সহায়তায় হিন্দুর পুরাণ, ধর্ম ও দর্শনের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। এই সমস্ত বাঙালি পন্ডিতদের সহায়তা সম্পর্কে মিশনারিরা কিছু মিতবাক। ওয়ার্ড যৎসামান্য বাংলা জানলেও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোন অধিকার ছিল না, সুতরাং পুরাণাদির অনুবাদে তাঁকে ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কেরী লাইব্রেরীতে রক্ষিত এমন তিন খানি পুঁথি ও খাতার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি সংস্কৃতের অনুবাদ – (১) সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থ 'বেদান্তসার'-এর গদ্যানুবাদ, (২) 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' – দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর গদ্যানুবাদ, এবং (৩) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের 'স্থূল তর্জমা' অর্থাৎ অধ্যায় অনুসারে সূচী। এর মধ্যে প্রথম পুঁথিটি ১৯৮৪ সালে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, এই অনুবাদ রামমোহনের বেদান্ত অনুবাদের চেয়ে সরল ও সুখপাঠ্য। এই পুঁথি রচিত হয়েছিল ১৮০৩ সালে। দ্বিতীয় পুঁথিটির অনুবাদক বা অনুবাদের সন তারিখ জানা যায় না, তবে মনে হয়, এটিও পূর্বেরটির মতো ১৯ শ শতকের প্রথম দিকেই অনূদিত হয়েছিল। শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমান প্রণব দেব এই পুঁথিটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এটির মূল্য অসাধারণ। কারণ রামমোহনের পূর্বে সংস্কৃত পুরাণের এমন সুললিত গদ্যানুবাদ দুর্লভ।

পুঁথিটির ('সুরথমেধসীয় সম্বাদ') ভূমিকায় সম্পাদক যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়েছেন, সুতরাং সে বিষয়ে নতুন কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই। পূর্বভারত, যে- কোন কারণেই হোক, শক্তি আরাধনার দেশ। এখানে তন্ত্রের প্রাধান্য সমধিক। অবশ্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর গৌড়-বঙ্গে বৈষ্ণবভাবনা প্রবলবেগে আত্মপ্রকাশ করে এবং শাক্তের মহামায়া বা আদ্যাশক্তির মতো রাধাঠাকুরাণীও মঠে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বলা হয়, ''কানু ছাড়া গীত নাই''। কিন্তু বোধ হয় একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে – ''রাধা ছাড়া গীত নাই''। তন্ত্রের প্রভাবে 'রাধাতন্ত্রম্'-ও লেখা হয়েছিল (অনুবাদক : সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)। বাংলাদেশ মধ্যযুগে দুই নারীর ভজনা করেছিল, একজন রাধা, বিজ্ঞানের ভাষায় যিনি Centre fugal force, এবং দুর্গা-কালিকা-মহামায়া, যিনি Centre petal force -এর প্রতীক। একজন প্রেয়সী, অন্যজন শ্রেয়সী। একজন শৃঙ্গার রসের ঘনীভূত নির্যাস, অপরজন স্নেহবাৎসল্যধারায় ভক্তকে প্লাবিত করেন, একজনের বিচরণ

ভূমি ভাববৃন্দাবন, অপরজন ঘরের জননী। শৃঙ্গাররস ক্রমে বিশুদ্ধ হয়ে 'উজ্জ্বলরসে' পরিণত হয়, কিন্তু এই রসের বিবর্তন সেখানেই থেমে যায় না, ক্রমে তা নানা যান-উপযানের মধ্য দিয়ে আবিলতার নালা বেয়ে আউল-বাউল-সহজিয়াদের রহস্যবাদী সাধন ভজন ও দেহচর্যা অবলম্বন করে পিন্ড দেহের মধ্যে অধরাকে ধরবার চেষ্টা করে। ক্রমে সূক্ষ্ম বৈষ্ণব রসতত্ত্ব লোকাচারের কবলীভূত হলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনা মাটিতে নেমে এল, কালিন্দী নদীকূল ক্রমে পূতিগন্ধময় পঙ্ক পল্বলে পর্যবসিত হল। কিন্তু শাক্ত সাধনা ও পদাবলীর সে রকম কোনো বিকার দেখা যায় না। কারণ আদিরসের ফেনিল উন্মত্ততা সহজেই গৌড়ী সুরায় পরিণত হতে পারে, কিন্তু শাক্ত স্নেহ ব্যৎসল্য কখনোই বিকৃত হতে পারে না।

এই অনুবাদ কে করেছিলেন এবং কবে করেছিলেন সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও অনুমান হচ্ছে ওয়ার্ড হিন্দুধর্ম সমাজ সম্বন্ধে যে বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ('A view of the History, Literature, and Religion of the Hindoos' etc. – 1806) এ - অনুবাদটি তারই জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। দেবী ভাগবতোক্ত -চন্ডীতত্ত্ব ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত, মধ্যযুগের কোন কোন বাঙালি কবি চন্ডী সপ্তশতীকে পয়ার ত্রিপদীতে বাঁধতে চেয়েছিলেন ; খুব যে সফল হয়েছিলেন তা মনে হয় না। কিন্তু অজ্ঞাতনামা অনুবাদকের 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' -এর গদ্যরীতি অতি পরিচ্ছন্ন। যদি এ পুঁথি ১৮০৬ সালের পূর্বে রচিত হয়ে থাকে (কারণ ওয়ার্ডের উল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থ ১৮০৬ সালেই প্রকাশিত হয়), তা হলে এ ভাষার মৌলিকতা মৃত্যুঞ্জয় -রামমোহনকেও অতিক্রম করে যাবে। আরম্ভ থেকেই একটু দৃষ্টান্ত দিই :

> পূর্বে জৈমিনি মুনি মার্কন্ডেয় মুনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহাশয়, তোমার নিকট আমি ধর্ম্ম প্রস্তাব শ্রবণ করিতে আসিয়াছি। বনে সুরথ রাজার সহিত মেধস মুনির যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই কথোপকথন আমি শ্রবণ করিতে আসিয়াছি, তাহা মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আজ্ঞা কর। পরে জৈমিনিকে মার্কন্ডেয় মুনি কহিলেন, এই ক্ষণে আমার কথার সময় নয়, কিন্তু তপস্যার সময়। অতএব আমি যে সময়ে ভাগুরী মুনিকে বিন্ধ্যাচলে ঐ কথা শ্রবণ করাই, তৎকালে চারি পক্ষি সেই স্থানে ছিল, তাহারা শ্রবণ করিয়াছে। তাহাদিক্কে বল, তাহারা তোমাকে শ্রবণ করাইবেক। এই কথা শুনিয়া জৈমিনি চারি পক্ষির নিকটে গিয়া তাহাদিক্কে কহিলেন, তোমরা

মার্কণ্ডেয় মুনির স্থানে যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তাহা আমাকে শ্রবণ করায় (করাও)। পক্ষিরা কহিতেছে, শ্রবণ কর।

এভাষা বিদ্যাসাগর- ভূদেব – বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর প্রথম পর্বের অনেক লেখক (মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া) বাংলা বাক্যগঠন রীতির কর্তা – কর্ম –ক্রিয়ার (SOV) বিন্যাস সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, কেরী প্রভৃতির বাইবেলি গদ্যের প্রভাবে ইংরেজি ঝোঁক অর্থাৎ কর্তা – ক্রিয়া – কর্ম (SVO) অনুসরণ করেছিলেন। এই পুঁথির ভাষায় তার কোন উল্লেখ নেই। এই সাধুরীতিই বাংলা গদ্যের যথার্থ রীতি, যেটি ১৭শ শতাব্দীর কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের সময় থেকে চলে আসছে। পরে মুসলমান শাসনের ফলে বাংলা বাক্য ও শব্দভান্ডারে বেশ কিছু আরবি ও ফারসি শব্দ প্রবেশ করলেও গদ্য-বিন্যাস পদ্ধতির কোনরূপ বিশৃংখলা হয়নি। কেরী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতেরা (মায় মৃত্যুঞ্জয় পর্যন্ত) শিষ্ট গদ্যরীতি আবিষ্কারের জন্য এতটা গলদ্‌ঘর্ম হয়েছিলেন কেন জানি না। এই গোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিমান লেখক মৃত্যুঞ্জয় (১) তৎসম-প্রধান সংস্কৃতায়িত গদ্য, (২) স্বচ্ছন্দ সাধুভাষা এবং (৩) গ্রাম্যভাষা – তিন ভাষাই 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় (১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত) পরীক্ষা করেছিলেন, তার পূর্বে 'রাজাবলি'তে (১৮০৮) সুবোধ্য সাধু গদ্যই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলা গদ্যরীতি (Style) নিয়ে এতটা কালক্ষেপ করেছিলেন কেন সেটাই প্রশ্ন। আনুমানিক ১৮০৬ বা তার পূর্বে অনূদিত এই 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ'-এর ভাষা থেকে মনে হচ্ছে, প্রায় দু'শ বছর আগে থেকেই বাংলা পুঁথিপত্রে সাধু গদ্যরীতির ব্যবহার চলে আসছিল। কেরী তার খবর রাখতেন না বলে অনর্থক সময় ব্যয় করে গোড়া থেকে বাংলা গদ্য সৃষ্টি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ও কি পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না?

পরিশেষে অত্যন্ত নিপুণভাবে পুস্তিকাটি সম্পাদনা করার জন্য শ্রীমান প্রণব কুমার দেবকে সাধুবাদ দিই। ৩৪ পৃষ্ঠার পুঁথির ৬৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা বিস্ময়কর বটে। সম্পাদক বহু পরিশ্রম করে ভারতীয় পুরাণ এবং বাংলা গদ্যের আদি পর্ব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করেছেন। একালের পাঠক-পাঠিকারা প্রায় দু'শ বছর আগেকার পুঁথির সঙ্গে পরিচিত হলে বাংলা গদ্যের বিবর্তনরেখা ধরতে পারবেন। সেদিক থেকে এ পুঁথিটির মূল্য অসাধারণ।

১৭. ৬. ৯৫,

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

।। মুখবন্ধ ।।

শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা গদ্য পুঁথিগুলি আকস্মিক ভাবেই খুঁজে পাওয়া গেল ১৯৮২ সালে। পুঁথিগুলি রচিত হবার প্রায় ১৯২বছর পরে আজ আমরা তার আলোচনা করতে বসেছি। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন বাংলা গদ্যচর্চায় এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন নিজেদের প্রয়োজনে,বাংলাভাষায় বাইবেল প্রকাশ ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাংলা গদ্যচর্চা সুরু করেন, ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য চালাবার জন্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র। ঈশ্বরানুগতচিত্ত সেই সাধকবৃন্দের সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কি না, সে কথা আজ আর বিচার্য্য নয়। কিন্তু একটি মহৎ আন্দোলনের উৎপত্তিস্থান রূপে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে শ্রীরামপুরের নাম চিহ্নিত হয়েছে, ১৮০০ সালকে সেই আন্দোলনের শুভসূচনাক্ষণ রূপে বাঙালি মনে রেখেছে। বস্তুত: বাংলা গদ্যের প্রচলন আগেও ছিল, তার রূপও যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপকভাবে নানা কাজে নানা বিষয়ের আলোচনায় তার ব্যবহার হয়নি। বহু ব্যবহারেই ভাষা গঠিত হয়, শাণিত হয়, সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়ে ওঠে। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় সাধকবৃন্দের সবচেয়ে বড় অবদান বোধহয় এই যে, তাঁরাই প্রথম বাংলা গদ্য ভাষাকে নানা কাজে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহৃত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে পন্ডিতমুনসিদের সহায়তায় চালিয়েছেন বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাংলা ভাষাকে রেভারেন্ড ড: উইলিয়াম কেরী যথার্থই ভালবেসে ছিলেন, বাংলা গদ্যভাষাকে ব্যাপকভাবে নানা কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন ; আজীবন তিনি সেকাজ করে গেছেন। আর মুদ্রণবিশারদ, কবি ও সাংবাদিক রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রধান, তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল মিশন প্রেসে মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থাদির বিচিত্র সম্ভার। আলোচ্য ''সুরথমেধসীয় সম্বাদ'' গদ্যপুঁথিটি এই ওয়ার্ড সাহেবের প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের সূচনা পর্বেই শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যচর্চার যে বিপুল আয়োজন করেছিলেন, তার সব নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বাংলা ভাষায় তাঁরা অসংখ্য প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, তার দু'একটি ছাড়া অধিকাংশই আজ আর পাওয়া যায় না। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকাদি, মিশনারিগণের রচনাবলী এবং নানা বিষয়ের ও বিবিধ লেখকের বিপুল সংখ্যক গ্রন্থসম্ভারও আজ দুষ্প্রাপ্য। এই সব মুদ্রিত রচনা ছাড়া শ্রীরামপুর মিশনের গদ্যচর্চার আর কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার আশা যখন সকলেই ছেড়ে দিয়েছেন, তখন শ্রীরামপুর কলেজের সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের মধ্য থেকে বাংলা গদ্যের এই অপ্রকাশিত নিদর্শনগুলি পাওয়া গেল। ''বেদান্তসার'' পুঁথিটি শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কাউন্সিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ' ১৯৮৪ সালে প্রকাশ

করেছেন। কিন্তু ''সুরথমেধসীয় সম্বাদ'' ও অন্যান্য রচনাগুলি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। ''সুরথমেধসীয় সম্বাদ'' সরল বাংলা গদ্যে দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর অনুবাদ প্রচেষ্টা। দুটি কারণে এতাবতকাল অপ্রকাশিত এই গদ্য পুঁথিটি আমাদের কৌতূহলী করে তোলে – প্রথমত: এর বিচিত্র ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত: এর ভাষা। এই দুটি বিষয়েই সাধ্যমত আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এই পুঁথিগুলির প্রতি বাংলা গদ্যসাহিত্যের গবেষক, ঐতিহাসিক এবং সুধী পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাঁরাই এদের প্রকৃত বিচার ও মূল্যায়ন করার অধিকারী। আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় তা হলেই এই শ্রম সার্থক হবে।

শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে ''সেন্ট্ পলস কলেজের'' অধ্যক্ষ ড: শৈলেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্পাদনা কর্মে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রী গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথিগুলির বিষয়ে নানা আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক ও বর্তমানে উক্ত গ্রন্থাগারের ''কনসালটেন্ট'' শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিত্য তাগাদা ও উপদেশ ব্যতিরেকে এ রচনা প্রকাশিতই হ'ত না। পুঁথির অস্পষ্ট অংশগুলির পাঠোদ্ধারে তাঁদের সকলেরই সাহায্য গ্রহণ করেছি। সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের প্রীতি ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড: অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করে এই গন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ভূমিকাটি যুক্ত হওয়ায় নি:সন্দেহে রচনাটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীরামপুর কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ Dr. J. T. K. Daniel এবং ''কাউনসিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ'' এই রচনার সঙ্গে ''সুরথমেধসীয় সম্বাদ'' গদ্যপুঁথিটি মুদ্রণের প্রয়োজনীয় অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। এই অবকাশে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীরামপুর কলেজের নবীন অধ্যাপক এবং বিবিধ গ্রন্থকার শ্রী বিজিত ঘোষ আমার প্রতি বিশেষ প্রীতি বশত: এই গ্রন্থপ্রকাশে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। সারস্বত সাধনায় তাঁর সর্বাঙ্গীন সিদ্ধি প্রার্থনা করি।

পুঁথিটির প্রকাশনায় SAP Impression -এর শ্রীমান অরূপ দাস এবং কর্মীবৃন্দের আগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে উৎসাহিত করেছে। একাজে যত্ন ও নিষ্ঠার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রণব কুমার দেব।

৪৫, এস. সি. দেব লেন,
কোন্নগর. জেলা : হুগলী ॥
২২ শে আষাঢ়, ১৪০২

পুঁথির আলোচনা

॥ ১ ॥

দেবীমাহাত্ম্য চন্ডী বাঙালীর অতি প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে এই কাব্যময় ধর্মগ্রন্থটি আমাদের ঘরে ঘরে ভক্তিভরে পঠিত হয়ে আসছে। সপ্তশতী মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্যের মন্ত্রে মন্ত্রে ভক্তিবিগলিত কবিচিত্ত যে সংস্কৃত ছন্দের গম্ভীর সুরঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, পুরাণকার যে অমৃতময় বাণী পরিবেশন করেছেন, জগতের ধর্মসাহিত্যে তার তুলনা বিরল। বৈদিক যুগথেকেই হিন্দুর ধর্মগ্রন্থগুলির দর্শনসমৃদ্ধ অমৃতময় বাণী ছন্দে ও সুরে গ্রথিত হয়ে এসেছে। ছন্দে সুরে অর্থে ভাবে সম্মিলিত এক প্রাণস্পর্শী ধ্বনিময়তাই তাদের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালীর সারস্বত সাধনা রূপ পেয়েছিল ছন্দে। চর্যাগীতি, বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ কাব্য ও জীবনী কাব্যের ধারায় বাঙালীর সাহিত্য সাধনা ছিল তখন কাব্যময়। সাহিত্যের আসরে গদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিগণ অনুভব করেননি। দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর স্তব ও বন্দনাময় পুরাণকথার অনুবাদে তাই সেকালের কবিগণ ছন্দকেই অবলম্বন করেছিলেন। দ্বিজ কমললোচনের 'চন্ডিকা বিজয়', ভবানী প্রসাদ রায় ও রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল', দ্বিজশ্রীনাথের 'দেবী পূজা' ইত্যাদি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মহীনাথ শর্মার 'মার্কন্ডেয় চন্ডী' অজ্ঞাত কবিদের মার্কন্ডেয় পুরাণ ও চন্ডীর পদ্যানুবাদের পুঁথিও পাওয়া গেছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবিগণও দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনায় কাব্যকেই অবলম্বন করেছিলেন। ক্ষীণ কাহিনী সূত্রে গাঁথা দেবীমাহাত্ম্যের স্তব স্তুতি বন্দনায় পুরাণকার যে মহৎ দর্শনসমৃদ্ধ ভক্তিভাবকে অপরূপ ছন্দে রূপ দিয়েছেন, একালের বাঙালী কবিগণও সে প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি। জয়নারায়ণ সেনের 'চন্ডিকামঙ্গল', রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'দুর্গামঙ্গল', কৃষ্ণকিশোর রায়ের 'দুর্গালীলা তরঙ্গিণী', গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবীমাহাত্ম্য চন্ডী', তিনকড়ি বিশ্বাসের শুম্ভনিশুম্ভ 'বধপালা' ইত্যাদি প্রচলিত ধারারই অনুবর্তন। উনিশ ও বিশ শতকের আরো অনেক কবি এই গ্রন্থটির কাব্যানুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য, রামগতি ন্যায়রত্ন কবি নবীনচন্দ্র সেন ও মহেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য[১]। বস্তুত: দেবীমাহাত্ম্যের মূল শ্লোকাবলীর সঙ্গে গদ্যে আক্ষরিক অনুবাদ অথবা সরলার্থ প্রকাশের নিদর্শন পাওয়া গেলেও স্বাধীন ভাবে গদ্যভাষায় গ্রন্থটির ভাবানুবাদের সংবাদ পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি শ্রীরামপুর কলেজের কেরীলাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' নামে একটি গদ্য পুঁথির সংবাদ পাওয়া গেছে। পুঁথিটি বাংলা গদ্য ভাষায় রচিত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর ভাবানুবাদ। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ড: শৈলেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেরীলাইব্রেরীর পুঁথিগুলির একটি পুর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। পুরাতন তালিকায় পুঁথিগুলির নাম থাকলেও তাদের রচয়িতা, রচনাকাল, লিপিকাল ও লিপিকারদের বিবরণ ছিল না। প্রাথমিক কাজ হিসাবে পুরাতন তালিকার সঙ্গে সংস্কৃত পুঁথিগুলি মিলিয়ে দেখা হচ্ছিল। এই সময়ে কেরী লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্য করেন যে তিনখানি বাংলা গদ্য পুঁথি ভুলক্রমে সংস্কৃত পুঁথিগুলির সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে। এই সংস্কৃত পুঁথিগুলি বড় বড় খাতার আকারে বাঁধান, একসঙ্গে দুটি বা তিনটি পুঁথিও বাঁধাই হয়েছে। কলেজের সংগৃহীত পুঁথির প্রাচীন তালিকায়[২] সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গে এই বাংলা পুঁথিগুলিরও নাম আছে। শ্রীরামপুর কলেজের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোন এক কালে অনবধান বশত বাংলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গে এই বাংলা গদ্য পুঁথিগুলি বাঁধাই ও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এরা সকলেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। এই বাংলা গদ্য পুঁথিগুলি হল :

(ক) সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের প্রকরণ গ্রন্থ 'বেদান্তসার' এর গদ্যানুবাদ,

(খ) 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' নামে দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডীর-গদ্যানুবাদ, এবং

(গ) ব্রহ্মবৈবর্ত ও কালিকাপুরাণের 'স্থূল তর্জমা' অর্থাৎ অধ্যায়ানুযায়ী সূচী।[৩]

বেদান্তসার পুঁথিটি ১৯৮৪ সালে শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কাউন্সিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ' প্রকাশ করেছেন।[৪] এর অনুবাদকের নাম জানা যায়নি, তবে অনুবাদক পুঁথির ভূমিকায় জানিয়েছেন যে পুঁথিটি 'আঠারশত তিন সালে রচিত হইল'। এটি অপর একটি ক্ষীণকায় সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গে একত্রে বাঁধাই করা। ব্রহ্মবৈবর্ত ও কালিকা পুরাণের 'স্থূল তর্জমা' দুটি উক্ত দুই পুরাণের অধ্যায়ানুসারে অতি সংক্ষিপ্ত বিষয় বর্ণনা মাত্র এবং অপর একটি পুরাণের সংস্কৃতে রচিত অধ্যায়ানুযায়ী বিষয় বর্ণনার পুঁথির সঙ্গে একত্রে বাঁধাই করা। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা প্রধানত: 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' নামে প্রাপ্ত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর

অনুবাদ পুঁথিটির পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

কলেজের প্রাচীন পুঁথির তালিকায় 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' নামেই পুঁথিটির পরিচয় পাওয়া যায়, অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। অনুবাদক পুঁথির কোথাও নিজের নাম বা রচনাকাল উল্লেখ করেননি। পুঁথিটির আকার অন্যান্য পুঁথির মতই - ৩২ x ২১ সেন্টিমিটার, হাফ্ লেদার বোর্ড বাঁধাই, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪। হাতে তৈরী একটু লাল্‌চে কাগজে পুঁথির ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা হয়েছে। ২৯ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠার কাগজ হলদেটে। উজ্জ্বল কালিতে মোটামুটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় পুঁথি লিখিত হয়েছে, প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ৩০ লাইন। আপাত দৃষ্টিতে সব পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক নেই, কিন্তু এক সময়ে ছিল। বাঁধাই এর পরে ধার ছাঁটাই করা হয়েছে, সে চিহ্ন বর্তমান। ছাঁটাই এর ফলে অনেক পত্রাঙ্ক যেমন বাদ পড়েছে, তেমনি পুঁথির নানা স্থানে মার্জিনে লিখিত সংশোধন চিহ্ন এবং সংযোজন কিছু কিছু কেটে গেছে। পুঁথিটি খন্ডিত নয়, আদ্যোপান্ত বক্তব্যের যোগসূত্র ও পারম্পর্য্য বিদ্যমান। কেরী লাইব্রেরীর অন্যান্য পুঁথির মতই কাগজের কোন রাসায়নিক গুণে পুঁথির কোথাও কীট দংশনের চিহ্ন নেই, তবে আর্দ্রতা পাতাগুলিকে কিছুটা নরম করেছে। বয়সের তুলনায় পুঁথির অবস্থা ভালই। লিপিকারকৃত সংশোধনের চিহ্ন অনেক, অল্প-বিস্তর পরিবর্জনও আছে। এক রকম হলদে রঙ্ পরিবর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যে হেতু সারা পুঁথিটিতে পরিবর্জন ও সংশোধনের ধারা একই রকম, তাই অনুমান করা যেতে পারে যে এই সংশোধন ও পরিবর্জন লিপিকার কৃত। পরিবর্জনের নমুনা হিসাবে বলা যায়, অনুবাদক 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু' কথাটিকে 'যে দেবী সর্ব্ব ভূতেতে' - এই রূপ অনুবাদ করেছিলেন। পরে ঐ বিখ্যাত স্তোত্রটির সর্বক্ষেত্রেই ঐ সর্বশেষ 'তে' - টি হলদে রঙে পরিবর্জন করা হয়েছে। সংশোধনের ক্ষেত্রে পুঁথিতে নানাপ্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এবং সংশোধিত অংশের হস্তাক্ষরও যে লিপিকারের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের অনুমান অনুবাদক এবং লিপিকার একই ব্যক্তি, এবং পুঁথিটি অন্য কোন পুঁথি থেকে অনুলিখিত নয়, অনুবাদকের মৌলিক রচনা। অনুলিখিত হলে এতো সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্জনের প্রয়োজন হতোনা। কেরী লাইব্রেরীতে পুঁথিটি কিভাবে এলো সে বিষয়ে আলোচনা কালে বিষয়টি আমরা বিচার করে দেখবো। পুঁথিরচনার কাল নিরূপণের সময় লিপির গঠন বিষয়েও কিছু আলোচনা করা যাবে। পুঁথিটির নামকরণ 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ'— অনুবাদককৃত, এবং প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম রূপে সেটি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

॥ ২ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ —এই ১৩টি অধ্যায় দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী নামে খ্যাত। ত্রিকালদর্শী ঋষি মার্কণ্ডেয় কথিত দেবী মাহাত্ম্য পরে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কে সেই প্রথম লিপিকার, বা কবে তা পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হল তা নিশ্চিৎ ভাবে বলা যায় না। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণ যে মহাভারতের পরে রচিত তা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের সুরুতেই দেখা যাচ্ছে যে ব্যাসের শিষ্য মহামুনি জৈমিনি তপস্যায় নিরত সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয়ের কাছে এসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারতের প্রশংসা করে বলেছেন, এই মহাভারতের কিছু তত্ত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা জানার জন্যই তিনি ঋষির কাছে এসেছেন। তাঁর প্রশ্ন হল, নির্গুণ নারায়ণ মানবরূপে কেন অবতীর্ন হলেন, কেনই বা দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের পত্নী হলেন, পাপের প্রশমন কর্তা বলদেবকে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে কেনই বা ব্রহ্মহত্যার পাপ করতে হল, আর দ্রৌপদীর পুত্রগণ কেনই বা অনাথের মত ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন ?[৫] সুতরাং মহাভারত মার্কণ্ডেয় পুরাণের পূর্বেই রচিত হয়েছিল এবং মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদগীতাও মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর পূর্বে রচিত। ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক Winternitz মার্কণ্ডেয় পুরাণকে "One of the oldest works of the whole Purana Literature" বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৬] তাঁর মতে এই পুরাণ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেরও আগে। তবে তিনি এবং আরো কোন কোন পাশ্চাত্যের পন্ডিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ —এই ১৩টি অধ্যায় ষষ্ঠ শতকের প্রক্ষিপ্তাংশ বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ভান্ডারকার আবার নানা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে, দেখিয়েছেন যে শ্রী শ্রী চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নয়, ঐ পুরাণেরই অংশ।[৭]

রাজ্য হারিয়ে মমতাবিষ্ট চৈত্র বংশীয় রাজা সুরথ সকাম সাধনায় মহামায়ার প্রসাদে কি করে মমত্বের আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন ও সাবর্ণ নামক অষ্টম মন্বন্তরাধিপ হলেন, আর দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীপুত্রাদি কতৃক বিতাড়িত বৈশ্য সমাধি নিষ্কাম সাধনায় দেবীর প্রসাদে কি করে মমত্ব হীন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন, —এই হল দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর বিষয়বস্তু। কাহিনীর মধ্য দিয়ে পুরাণকার মায়া মোহ মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন , ব্যাখ্যা করেছেন তন্ত্রশাস্ত্রের সার কথা মহামায়া তত্ত্বকে। বিশাল তন্ত্রশাস্ত্রের এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি দেবীমাহাত্ম্যের তিনটি চরিত্রের মধ্য

দিয়ে সংক্ষেপে এক অনবদ্য ভক্তিরসসিক্ত সুললিত ছন্দে ব্যক্ত হওয়ায় এ গ্রন্থ তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে এত সমাদৃত। হিন্দুর কাছে দেবীমাহাত্ম্য শুধু কাহিনী নয়, কাব্য নয়, এ হল মন্ত্র। তাই স্মরণাতীত কাল থেকে দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর পাঠ ও শ্রবণ স্বস্ত্যয়ন রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে।

দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম চরিতে বর্ণিত হয়েছে মেধস মুনির আশ্রমে রাজ্যহীন সুরথ ও স্ত্রী পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত বৈশ্য সমাধির মধ্যে আপন আপন মায়া মোহ জনিত সমস্যার আলোচনা ও মেধস মুনির উপদেশ, কাহিনীর সুরু এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তামসী মহাদেবীর স্তব ও মধুকৈটভ বধ। দ্বিতীয় চরিতে মহিষাসুরের শতবর্ষব্যাপী অত্যাচার ও স্বর্গচ্যুত দেবতাদের কথা, দেবগণের তেজঃপুঞ্জ থেকে ধৃতায়ুধা সিংহবাহিনী সালঙ্কারা বিশ্বমোহিনী রূপবতী দেবী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব, দেবী কর্তৃক মহিষাসুরের সৈন্য বধ, মহিষাসুর বধ ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দেবী ভগবতীর বন্দনা। তৃতীয় চরিতে বর্ণিত হয়েছে শুম্ভনিশুম্ভের অত্যাচার ও দেবগণের দেবী বন্দনা, দেবী কৌশিকীর আর্বিভাব ও অসুর দূত সংবাদ, দেবী কর্তৃক ধূম্রলোচন, চন্ড, মুন্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ বধ এবং দেবগণের নারায়ণী বন্দনা, ফলস্তুতি ও দেবীর বরদান, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের তপস্যা ও ঈষ্টলাভ। মার্কন্ডেয় চন্ডীর বিষয়বস্তু এই পর্যন্ত হলেও যেহেতু সপ্তশতী মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্য মাতৃসাধনার পথ, তাই চন্ডী পাঠের কিছু বিধি বিধান আছে। চন্ডীপাঠের পূর্বে দেবীসূক্ত, অর্গলা স্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী কবচ ও রাত্রি সূক্ত অবশ্য পঠনীয়। তা ছাড়া প্রতি অধ্যায়ের সুরুতে আছে দেবীর ধ্যানমন্ত্রাদি এবং পরিশেষে সপ্তশতী রহস্যত্রয় ও অপরাধ- ক্ষমাপন স্তোত্র।

মহর্ষি অম্ভৃর ব্রহ্মবাদিনী কন্যা বাক্ কথিত দেবী সূক্তের আটটি মন্ত্রে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা ও মহামায়ার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। শ্রী শ্রী চন্ডীর মৌলিক উপাদান এই সূক্তের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য দেবী সূক্তেরই কাহিনী ভিত্তিক বিশ্লেষণ। দেবী সূক্ত না পড়ে চন্ডীর তত্ত্বে প্রবেশ তাই শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এর উদ্দেশ্য মাতৃসাধনার দার্শনিক ভিত্তিটি সাধকের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। মহামায়া তত্ত্বে প্রবেশের আগে বর্হিমুখী চিত্তকে অর্ন্তমুখী এবং ফলাকাঙ্ক্ষী করার জন্যই অর্গলা স্তোত্র পাঠের বিধান। এই স্তোত্র পাঠে অর্ন্তমুখী চিত্তে চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয়গুলি প্রবেশ করতে পারে না। অর্গল শব্দের অর্থ যেমন খিল, তেমনি কীলক শব্দের অর্থ বাধা বা অভিশাপ। চন্ডীমন্ত্রের উপর মহাদেবের অভিশাপ আছে, সেই

অভিশাপ দূর না করে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করলে সাধনা সফল হয় না। কীলকের প্রতিপাদ্য হল অধিকারী নির্ণয়, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী কোন অবস্থায়, কি রকম মানসিক উন্নতি ও সাধনা নিয়ে মাতৃ তত্ত্বে প্রবেশ করবেন, কীলক স্তবে তারই নির্দ্দেশ। সুতরাং কীলক স্তোত্র নিষ্কীলক মন্ত্র, সকাম বা নিষ্কাম সাধক স্তোত্র নির্দ্দিষ্ট আত্মিক উন্নতি করে, অধিকারী হয়ে তবেই দেবীর সাধনা ও তত্ত্বে প্রবেশ করবেন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অভিলাষী সাধক সপ্তশতী দেবী মাহাত্ম্য পাঠের পূর্বে দেবী কবচ পাঠ করে কবচ নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মাতৃ মন্ত্রে মনকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করবেন নির্বিঘ্নে সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য। সর্বব্যাপিনী রাত্রিদেবী অভিষ্ট দায়িনী, জগৎ মাতার প্রীতির জন্যই চন্ডীপাঠের পূর্বে রাত্রিসুক্ত পাঠের বিধান। অভিষ্ট ফলসিদ্ধির জন্য দেবীমাহাত্ম্য পাঠের শেষে সপ্তশতী রহস্যত্রয় পাঠ করতে হয়, এই রহস্য ত্রয় হল প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য এবং মূর্তি রহস্য। অর্থাৎ সর্বাত্মক শুদ্ধি ও মনোযোগ আকর্ষণই দেবী মাহাত্ম্যের প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক স্তব কবচ সূক্তাদির লক্ষ্য।[৮] কাত্যায়নী তন্ত্র বলেন:

"অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মনু ন ক্ষমঃ।
অঙ্গষটক্ বিহীনা তু তথা সপ্তসতী স্তুতি॥"

সুতরাং পূর্বোক্ত স্তোত্র সূক্ত কবচ ও প্রকরণাদি সহ সপ্তশতী মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্যই সম্পূর্ণ চন্ডী।

এ বিষয়ে এতদূর আলোচনার কারণ এই যে, আলোচ্য দেবী মাহাত্ম্যের গদ্যানুবাদ 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিটিতে কেবল তিন চরিত্র সম্বলিত কাহিনী অংশটুকুই অনূদিত হয়েছে। অনুবাদক দেবী সূক্ত, অর্গলা স্তোত্র, কীলক স্তব, রাত্রিসূক্ত বা রহস্যত্রয়ের কোন অনুবাদ করেননি। এখন প্রশ্ন হল, অনুবাদক অঙ্গহীন চন্ডীর অনুবাদ কেন করলেন এবং অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচলিত ধারা অনুসারে সুললিত ছন্দোময় সপ্তসতী চন্ডীমন্ত্রের পদ্যানুবাদ না করে গদ্যানুবাদই বা কেন করলেন? সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বৃহত্তর বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে চন্ডীমন্ত্রের সুপ্রচারই যদি তাঁর কাম্য হোত তাহলে অবশ্যই তিনি গ্রন্থটির সুললিত কাব্যানুবাদে প্রয়াসী হতেন এবং স্তব কবচ সূক্তাদি সহ পূর্ণাঙ্গ চন্ডীরই অনুবাদ করতেন। তা ছাড়া কেনই বা পুঁথিটিতে অনুবাদকের নাম নেই, কবে এবং কি ভাবেই বা এই গদ্য পুঁথিটি শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগারের পুঁথি সংগ্রহে স্থান পেলো, আর ১৮০০

সাল থেকে মিশন প্রেস যে অংখ্য পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, –যে তালিকায় বাইবেল থেকে মহাভারত সহ বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়,– 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' কেন সে তালিকায় স্থান পেলোনা ? পেলে উনিশ শতকের আদি পর্বের বাংলা গদ্যের একটি মূল্যবান নিদর্শন আগেই প্রকাশিত হোত। এ সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য শ্রীরামপুর মিশনের আদি ইতিহাসের একটু পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

॥ ৩ ॥

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাসে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), শ্রীরামপুর মিশন তথা মিশন প্রেসের যে একটা গুরুতপূর্ণ ভূমিকা ছিল একথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষীয় সমাজে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরাজ ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরী ইংলন্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছান ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর। নানা দুঃখ-দুর্দশা ও বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে তাঁর ছয়টি বছর অতিবাহিত হবার পর ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি মদনাবাটী থেকে শ্রীরামপুর এসে জসুয়া মার্সম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সঙ্গে যোগ দেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এর কিছুকাল পূর্বেই মার্সম্যান এবং ওয়ার্ড দিনেমার কেন্দ্র ফ্রেডারিক নগর বা শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছেছিলেন। একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। উইলিয়াম কেরীর মত ধীমান সংগঠক এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় অবিলম্বেই প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন, এবং কেরীর সঙ্গে আনা কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে সুরু হল বাইবেল ছাপার কাজ। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস পাঠকের কাছে সে তথ্যও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনের সেই প্রথম যুগে, পথে ঘাটে বাজারে বা জনসমাবেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারে ব্যপটিষ্ট মিশনারি বৃন্দের প্রধান অবলম্বন ছিল Tract বা প্রচার পুস্তিকা। তাই বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রণের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে অনভ্যস্থ বাংলা ভাষায় পাঁচ-দশ পাতার নানা রকম প্রচার পুস্তিকা রচনা ও মুদ্রণ। গদ্যে ও পদ্যে রচিত এই সব পুস্তিকার বিষয় বস্তু ছিল খ্রীষ্টের জীবনী ও বাণী, পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক তীব্র বিরোধিতা ও তার সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রশস্তি। তবে মিশনের নতুন ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত এ রকম লক্ষ লক্ষ কপি প্রচার পুস্তিকা গুলির আক্রমণের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুর বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবী, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান

ও তার ব্রাহ্মণ সমাজ। কেরী, ওয়ার্ড, মার্সম্যান প্রমুখ মিশনারি গণ নিয়মিত নিকট ও দূর অঞ্চলে প্রচার অভিযানে বেরিয়ে এরকম হাজার হাজার প্রচার পুস্তিকা বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। 'কলে ছাপা' এই সব পুস্তিকা, এবং খুব সীমিত ক্ষেত্রে দু'এক কপি বাইবেল পাবার জন্য জলসাধারণের প্রবল উৎসাহ দেখে তাঁরা নিজেরাও উৎসাহিত হতেন। ওয়ার্ড সাহেবের জার্নালে এবং মিশনের 'পিরিয়ডিক্যাল একাউন্টসে' এ বিষয়ে বিষদ বিবরণ ও এই কালে মিশনারি গণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। মিশনারি গণই এই সব প্রচার পুস্তিকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতেন, বাংলা ভাষায় অতিশয় সীমিত জ্ঞান সম্বল করে নিজেরাও কিছু কিছু লিখতেন। কিন্তু তার জন্য তাঁদের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল হিন্দুদের দেব দেবী, ধর্ম দর্শন ও আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার — আর সে ধারণা লাভ করবার জন্যই তাঁরা বহু প্রয়াস ও অর্থব্যায়ে সংগ্রহ করেছিলেন সংস্কৃত বেদ, উপনিষদ দর্শন ও পুরাণাদির পুঁথি। শ্রীরামপুর মিশন অর্থের বিনিময়ে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ পন্ডিতকেও প্রচার পুস্তিকা রচনা ও পরিমার্জনার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বিষয় নির্বাচন, পরিকল্পনা ও প্রচারমূলক আক্রমণের ধারা নিরূপণ সর্বদা মিশন কর্তৃপক্ষকেই করতে হোত। সত্বর বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করার জন্য মিশনারি গনের যে একান্ত প্রচেষ্টা, এও তার এক অন্যতম কারণ।

বস্তুত, এই সব শাস্ত্রীয় পুঁথি সংগ্রহ করা মিশনারিগণের পক্ষে সহজ হয়নি। সেকালে টোল এবং ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণের ব্যক্তিগত সংগ্রহে শাস্ত্রীয় পুঁথি পাওয়া গেলেও বিধর্মীর কাছে বেদ, উপনিষদ পুরাণাদির পুঁথি হস্তান্তর করা পাপ কর্ম বলেই বিবেচিত হোত। তাই শেষ পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে এই সব দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করা মিশরারিদের পক্ষে সম্ভব হলেও, কি করে কোথা থেকে পুঁথিগুলি আসছে, সে বিষয়ে সংগ্রাহকগণ সম্পূর্ণ নীরব। যতদূর দেখা গেছে, মিশানারিগণের সংগৃহীত পুঁথিগুলিতে লিপিকারের নাম পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন। উইলিয়াম কেরী ছিলেন অতিশয় সামাজিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ভাষাবিদ্ পন্ডিত। ধর্মীয় গন্ডীর বাইরে তাঁর পান্ডিত্য ও মানবিকতা বোধ সমকালীন বহু ব্রাহ্মণ-পন্ডিতকেও মুগ্ধ করেছিল। তাই শুধু অর্থ নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কও পুঁথিসংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর সহায়ক হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক ও অনুলেখকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই মিশনারিগণ কখনো তাঁদের নাম প্রকাশ করেননি। ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ এক পত্রে উইলিয়াম কেরী সাট্‌ক্লিফ্‌কে লিখেছেন :

"An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having this mysterious sacred nothings (which have mentioned their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested Brahmins) exposed to view, has induced me, among other things to write the Sanskrit grammar, and to begin a dictionary of that language."

তিনি আরো লেখেন :

"I have long wish to obtain a copy of the Veda, and am now in hopes I shall be able to procure all that are extent. A Brahmin this morning offered to get them for me for the sake of money. I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico." [৯]

বস্তুত হিন্দুর শাস্ত্রসমূহ, বিশেষত: চতুর্বেদ ইংরাজী অনুবাদ সহ মুদ্রিত করে পাশ্চাত্য জগতে এই মহাগ্রন্থের অসারতা প্রমাণের একটা চেষ্টা সে সময়ে হয়েছিল। রে: উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে ১৮০৩ সালের ১লা এপ্রিল লিখেছেন :

"Mr. Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vades which he has been able to procure, if we will print them : and this we have promised to do."

অবশ্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কাশীদাসী মহাভারত এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হলেও শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত বেদ, উপনিষদ বা পুরাণাদির কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে পুঁথি সংগ্রহ বেশ কিছুকাল অব্যাহত ছিল। মিশনারিগণের দৈনন্দিন হিসাবের খাতায় এই রকম পুঁথি কেনার কিছু প্রমাণ আছে। প্রকাশিত না হলেও হিন্দুর ধর্ম-দর্শন ও পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে এই পুঁথিগুলি মিশনারিগণের যথেষ্ট কাজে লেগে ছিল। তাঁদের অসংখ্য প্রচার পুস্তিকায় উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে হিন্দুর দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে যে তীব্র কটাক্ষ দেখা যায় তার উপকরণের অন্যতম উৎস যে এই পুঁথিগুলি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মপ্রচারের কালে পৌত্তলিকতা বিরোধী যুক্তি তর্কের অবতারণায় এবং বাদানুবাদেও এই সব পুঁথিগত জ্ঞানই ছিল মিশনারিগণের প্রধান অবলম্বন। রে: ওয়ার্ডের জার্নালে সেরকম অনেক কৌতুক জনক ঘটনার বিবরণ আছে। যাইহোক সেদিন শ্রীরামপুরের মিশনারিবৃন্দ এই ব্যাঙ্গ্য-বিদ্রূপময় প্রচার

পুস্তিকাগুলির মাধ্যমে সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্মকে নস্যাৎ করে দেবার যে ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন, তা সফল হয়নি। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় যে তা সম্পূর্ণ বিফলও হয়নি। কারণ উনিশ শতকের ঊষালগ্নে তাঁদের সেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মধ্যদিয়েই সুরু হয়েছিল সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের পথকে প্রশস্ত ও মসৃণ করার সাধনা। সে সাধনায় এই অন্যায় বিদ্বেষ প্রসূত, কটাক্ষপূর্ণ Tract গুলির ভূমিকা মোটেই উপেক্ষা করার মত নয়। মিশনারিগণের মধ্যে য়াঁরা বাংলা লিখতেন, তাঁদের বাংলা গদ্য লেখায় হাত পাকাবার কাজ অধুনা লুপ্ত এই প্রচার পুস্তিকা গুলির মাধ্যমেই হয়েছিল। বহুদিন পূর্বেই সেই বাদানুবাদ থেমে গেছে, শুধু তার অম্লান স্মৃতি চিহ্নরূপে সংগৃহীত পুঁথিগুলি বাংলা গদ্য চর্চার অন্যতম পীঠস্থান শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগারে আজও সুরক্ষিত রয়েছে।

মিশনারিগণের সংগৃহীত এই পুঁথিগুলির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত পুঁথিগুলি সবই অনুলিখিত এবং খাতার আকারে বাঁধান, আকার ৩২ x ২১ সেন্টিমিটার, হাফ্ লেদার বোর্ড বাঁধাই। হাতে তৈরী হলদে অথবা ঈষৎ লালচে কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল কালিতে পুঁথিগুলি লেখা হয়েছে। নিজেদের ব্যবহারের সুবিধার জন্যই মিশনারিগণ বই এর আকারে এই রকম বাঁধান পুঁথি তৈরী করিয়েছিলেন। কাগজের কিছু রাসায়নিক গুণ আছে, যে জন্য কীট দংশন থেকে পুঁথিগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত। পুঁথিগুলির প্রতিটি পাতা আলাদা, লেখার পরে তাদের বাঁধাই এবং ধার ছাঁটাই করা হয়েছে। অনেক সংস্কৃত পুঁথিই বাংলা অক্ষরে লিখিত। অবশ্য নানা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সংস্কৃত পুঁথি বাংলা অক্ষরে লেখার প্রচলন ছিল। প্রায় সব পুঁথিরই সংস্কৃত অথবা বাংলা হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। এক একটি পাতায় গড়ে ৩১ লাইন লেখা হয়েছে। অধিকাংশ পুঁথিতেই কিছু কিছু লিপিকার প্রমাদ, সংশোধন ও সংযোজন দেখা যায়, সংস্কার ও পুনর্লিখনের নিদর্শনও আছে। মিশনারিগণের সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলি বাংলা পুঁথিও আছে। যেমন, 'গঙ্গা মঙ্গল গীত', 'গীতচিন্তামণি', 'গৌরী মঙ্গল', 'নারদ সম্বাদ' ও এমন আরো অনেক। এগুলি সবই সমকালে প্রচলিত মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য। সংস্কৃত পুঁথিগুলির অনুরূপ কাগজ ও কালিতে এই পুঁথিগুলিও অনুলিখিত, শুধু ব্যতিক্রম হল এদের আকার। সংস্কৃত পুঁথিগুলির আকার যেখানে ৩২ x ২১ সে:মি:, সেখানে প্রায় সব বাংলা পুঁথির আকার ২৩ x ১৬ সে:মি:।

এবার আমাদের আলোচ্য 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিটির বিষয়ে পুনরায় ফিরে আসা যাক্। সুরথমেধসীয় সম্বাদ, বেদান্তসারের বাংলা অনুবাদ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ও কালিকা পুরাণের 'স্থূল তর্জমার' পুঁথিগুলির আকার সংস্কৃত পুঁথিগুলিরই অনুরূপ ৩২ x ২১ সে:মি:, আর সেগুলি সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গেই শ্রেণীবদ্ধ। সেখানে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকা পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার প্রকরণের সংস্কৃত পুঁথিও আছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে কোন কারণে ঐ সংস্কৃত পুঁথিগুলির বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন হয়েছিল এবং শুধু ঐ তিনখানি নয়, হয়তো আরো অনেক পুঁথির অনুবাদ করান হয়েছিল। কিন্তু উক্ত তিনটি বাংলা গদ্য পুঁথিই কেবল কালগ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে আজো গ্রন্থাগারে রয়েছে। এই সূত্রে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮১২ সালের বিখ্যাত অগ্নিকান্ডের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেই অগ্নিকান্ডে বহু পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য বই পত্র ও নূতন ছাপা বই ধ্বংস হয়। যাই হোক্, 'বেদান্তসার' যেমন মিশনারিগণের সংগৃহীত সদানন্দ যোগীন্দ্রের উক্ত নামা সংস্কৃত প্রকরণ পুঁথি থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল তেমনি 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' গদ্য পুঁথিটিও তাঁদের সংগৃহীত মার্কণ্ডেয় পূরাণের সংস্কৃত পুঁথি থেকে অনূদিত হয়েছিল। 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায়ের অনুবাদ হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এতে প্রচলিত দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক স্তব-কবচ-সূক্তাদি এবং মধ্যবর্তী ধ্যান মন্ত্রাদি নেই। প্রয়োজনের তাগিদে অনুবাদক শুধু নির্দ্দেশিত কাহিনী অংশটুকুই সম্ভবত: অর্থের বিনিময়ে যথাসাধ্য অনুবাদ করে দিয়েছেন — বৃহত্তর বাঙালী সমাজে দেবীমাহাত্ম্যের প্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

॥ ৪ ॥

দেবীমাহাত্ম্যের কাহিনী অংশটুকুর বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন কার হ'ল এবং কি সে প্রয়োজন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীরামপুর মিশনের রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ডের বিচিত্র কর্মকান্ডের দিকে আমাদের নজর পড়ে। রেভারেন্ড ওয়ার্ড ছিলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রাণ স্বরূপ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে মিশন প্রেস থেকে নানা ভাষায় বাইবেল ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাবলী এবং অন্যান্য বহু বাংলা বই ও প্রচারপুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাই উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান সুচিহ্নিত হয়েছে। বাংলা

গদ্যের ক্রমবিকাশে তাঁর আর কোন অবদান আছে কিনা সে কথা বিচার করার আগে তাঁর জীবন, কর্ম ও সাধনার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন।

ইংলন্ডের ডার্বি নগরের এক সাধারণ পরিবারে ১৭৬৯ সালে রেভারেন্ড উইলিয়াম ওয়ার্ডের জন্ম হয়। কিশোর বয়স থেকেই অতিশয় ধর্মপ্রাণ উইলিয়াম স্কুলের শিক্ষার শেষে মুদ্রণ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথম জীবনে তিনি 'ডার্বি মার্কারী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। পরে, তিনি 'মর্নিং ক্রনিকল' এবং 'হাল এড্ভারটাইজার' নামে দুটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। মুক্তমতি ওয়ার্ড ছিলেন কবি ও সাংবাদিক - সম্পাদকীয় কলমে সেকালে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রবক্তা হওয়ায় তিনি রক্ষনশীল রাজতন্ত্রের ভীতির কারণ হয়েছিলেন। তাঁর মত সুলেখক ও সুবক্তা ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি পরায়ণ হওয়ায় এবং দাসপ্রথা বিরোধী মতামত প্রকাশ করতে থাকায় আদালতেও অভিযুক্ত হন। কিন্তু ১৭৯৬ সালে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে তাঁর মানসিকতা ও মতাদর্শের পরিবর্তন হতে থাকে। ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করে তিনি গ্রীক্ ভাষা শেখেন, পরে ১৭৯৮ সালে ব্যপ্টিষ্ট মিশনারি সোসাইটির সংস্পর্শে আসায় ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। অনতিকাল পরেই উক্ত সোসাইটির কর্ণধার মিঃ ফুলারের অনুরোধে ভারতে বাইবেল মুদ্রণের কাজে উইলিয়াম কেরীকে সাহায্য করতে তিনি দিনেমার কলোনি শ্রীরামপুরে এসে উপস্থিত হন। ১৮২৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয় শ্রীরামপুরে। কিন্তু তার আগে পর্য্যন্ত ধর্মপ্রচার, মিশন প্রেসের তত্ত্বাবধান ও মিশনের নানাবিধ কাজে তাঁর শ্রীরামপুরের জীবন ছিল অতিশয় কর্মবহুল। ধর্মপ্রচারের কাজে তিনি যে বিশেষ আনন্দ পেতেন, তা তাঁর দিনলিপির পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে ধর্মপ্রচারের কাজে সারা বাংলা দেশের গ্রামে-গঞ্জে তিনি পরিভ্রমণও করেছেন প্রচুর। দেশীয় মানুষের সঙ্গে নিত্য কথাবার্তা বলতে বলতে অবিলম্বেই তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন, কিন্তু মুদ্রণের কাজের বাইরে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল না। শোনা যায় তিনি বাংলায় পিতম্বর সিংহের জীবনী লিখেছিলেন এবং "The happy Death"- এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। নিজে এবং ফেলিক্স কেরীর সঙ্গে কয়েক খানি বাংলা Tract বা প্রচার পুস্তিকাও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সব রচনা বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। চারখানি ইংরাজী গ্রন্থের তিনি রচয়িতা-তার মধ্যে প্রধান হল চার খন্ডে রচিত "Account of the Writings Religion and Manners of the Hindoos - Including Transla-

tions of their Principle Works" নামক বিশাল গ্রন্থটি। ১৮১১ সালে তাঁর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। রেভারেন্ড ওয়ার্ডের এই গ্রন্থ রচনার ইতিহাসের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিরহস্যের সমাধান সূত্রটি নিহিত রয়েছে।

দীর্ঘ দশ-এগার বছরের পরিশ্রম ও যত্নে হিন্দু জাতির বিষয়ে সংগৃহীত রে: ওয়ার্ডের তথ্যাবলী তাঁর এই "Accounts of the Writings Religion and Manners of the Hindoos..." গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দুর সুপ্রাচীন ধর্মদর্শনকে বিচার করলেও এই বিশাল গ্রন্থটিতে রে: ওয়ার্ড যে অসংখ্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন, সে কালে সে রকম প্রয়াস বিরল ও বিস্ময়কর ছিল। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন :

> ".... yet having resided more than eleven years in Bengal, during which time he (the author) has endeavoured to make himself acquanted with the works, religion manners and customs of the Hindoos, and for ten years of that period spent most of his leisure in obtaining. informations and making translations for this work, he hopes that the materials here collected will be found to furnish a more correct and complete account of the Shastras, Religions, Manners and Customs of the Hindoos than any thing which has hitherto been published on the subject...."

বস্তুত: এই বিশাল গ্রন্থটিতে রে: ওয়ার্ড আপন দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুজাতির সমাজ ধর্ম দর্শন ইতিহাস সাহিত্য ও নানা আচার অনুষ্ঠানের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিবরণকে যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য তিনি পঞ্চোপাসক হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবী ও উপাসনার পরিচয় দিয়েছেন, ষড়দর্শনের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কোল্‌ব্রুক সাহেবকে অনুসরণ করে নিজস্ব মন্তব্য সহ চতুর্বেদের পরিচয় দিয়েছেন। দর্শনিক মতবাদের পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থের প্রথম খন্ডে সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রকরণ গ্রন্থ 'বেদান্তসার' –এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে রামায়ণ মহাভারত শ্রীভাগবত, স্কন্দ পুরাণ থেকে উৎকল খন্ড, মার্কন্ডেয় পুরাণ থেকে 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' নামে দেবী মাহাত্ম্য চন্ডী, কালিকা পুরাণ, কল্কী পুরাণ, কাশী খন্ড, গঙ্গাবাক্যাবলী, জ্যোতিষ তত্ত্বসার, নাড়ি প্রকাশ, নিদান সংগ্রহ ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে আলোচনার সূত্রে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি হিন্দুর শাস্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্তসার দেবার চেষ্টা করেছেন। একদা উইলিয়াম কেরী হিন্দুর যে শাস্ত্র সমূহকে

"mysterious sacred nothings" বলে উল্লেখ করেছিলেন, যা এতোদিন কেবল মাত্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানেই জনচক্ষুর আড়ালে ছিল, এবং যে শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করে তাদের তত্ত্ব জানার জন্য মিশনারিগণের চেষ্টার অন্ত ছিলনা, রে: ওয়ার্ড কি তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে এইভাবে হিন্দুর সেই ধর্মদর্শন তত্ত্বকে ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে, তাদের অসারত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন? অন্তত: উক্তগ্রন্থের নানা স্থানে তাঁর নিজের অনভিজ্ঞতা-প্রসূত মন্তব্যগুলির ধরণ থেকে সে কথাই মনে হয়।

কিন্তু এই গ্রন্থটিতে ইংরাজী অনুবাদে হিন্দুর দর্শন ও শাস্ত্রসমূহের এই বিপুল সমাবেশ ঘটানো তাঁর মত বিদেশীর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? একথা এখন নিশ্চিত রূপেই বলা যায় যে উক্তগ্রন্থে রে: ওয়ার্ডের পরিবেশিত ইংরাজী অনুবাদগুলির প্রাথমিক উৎস ছিল শ্রীরামপুর মিশন সংগৃহীত শাস্ত্রপুরাণাদির সংস্কৃত পুঁথিগুলি - সে গুলি সর্বদাই তাঁর হাতের কাছেই ছিল। রে: ওয়ার্ড সংস্কৃত জানতেন না, সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণাদির পুঁথি ইংরাজীতে অনুবাদ করার মত সংস্কৃত জ্ঞান তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষা পড়তে এবং বুঝতে পারতেন, অল্পবিস্তর লিখতেও পারতেন। এই গ্রন্থটি রচনার জন্যই তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল উক্ত সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহের সরল বাংলা গদ্যানুবাদ, যা থেকে সহজেই তিনি ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করে দিতে পারেন। অর্থের বিনিময়ে সংস্কৃত পুঁথিগুলির বঙ্গানুবাদ করে দেবার লোকেরও অভাব ছিল না, যে সব গোপন সূত্রে সংস্কৃত পুঁথিগুলি সংগৃহীত ও অনুলিখিত হয়েছিল, হয়তো তাঁরাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন কোন পুঁথির বঙ্গানুবাদ অথবা কালিকা পুরাণের ক্ষেত্রে অনুবাদক যেমন বলেছেন 'স্থূল তর্জমা'- তাই করে দিয়েছেন। তবে এ কাজ সহজে হয়নি, ১৮০১ সাল থেকে দীর্ঘ আট-নয় বছর ধরে চলেছে এই অনুবাদ এবং অনুবাদের অনুবাদ কর্ম। এইভাবেই 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিটি মিশন সংগৃহীত মার্কণ্ডেয় পুরাণের পুঁথি থেকে অনূদিত হয়েছিল, এবং রে: ওয়ার্ডের প্রয়োজন অনুসারে পদ্যে নয়, গদ্য ভাষাতেই সে অনুবাদ করা হয়। হিন্দুর ঘরে ঘরে পঠিত ও অতিশয় সমাদৃত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর কাহিনীটিই কেবল রে: ওয়ার্ডের প্রয়োজন ছিল তাঁর গ্রন্থের জন্য, এই মহাগ্রন্থের অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্বে প্রবেশ করবার আকাঙ্ক্ষা ও মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাই এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক স্তব-কবচ-সূক্তাদি এবং মধ্যবর্তী ধ্যানমন্ত্রাদির প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকেই শ্রীশ্রী চণ্ডীর কাহিনীটি, শুধু কাহিনী সূত্রে গ্রথিত স্তব ও

বন্দনাগুলি সহ বঙ্গানুবাদ করিয়েছেন। এই গোপনীয়তা ও উদ্দেশ্যমূলকতার জন্যই পুঁথিটি দুর্লভ 'অটোগ্রাফ্' জাতীয়, অর্থাৎ অনুবাদকের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি বলে আমাদের মনে হয়েছে। এর সংশোধন পরিমার্জন ইত্যাদি সবই অনুবাদকের স্বহস্তকৃত। এই একই ভাবে আমরা পেয়েছি সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার এর গদ্য পুঁথি। কালিকা পুরাণের 'স্থূল তর্জমা'র উদ্দেশ্যও ছিল একই। সুতরাং 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ', 'বেদান্তসার' এবং কালিকাপুরাণের ''স্থূল তর্জমার'' বাংলা গদ্য পুঁথিগুলি অন্যকোন পুঁথি থেকে অনুলিখিত পুঁথি নয়, এগুলি অনুবাদকদের মূল রচনা। রে: ওয়ার্ড এই বাংলা পুঁথিগুলি অবলম্বন করেই প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর ইংরাজী তর্জমা। তাঁর ইংরাজীর সঙ্গে বাংলা পুঁথিগুলি মিলিয়ে দেখলেই তা প্রতিপন্ন হবে। অনুবাদকগণ আন্তরিক প্রেরণায় এই সব অনুবাদ করেননি, জনসাধারণের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্য বা অদ্বৈতবেদান্তের প্রচারও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলনা- অর্থের বিনিময়ে ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ ফরমাস্ তালিম করেছেন মাত্র। তাই পুঁথিগুলিকে স্বীয় নামাঙ্কিত করার প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেননি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে শ্রীরামপুর মিশনের কোন কাগজপত্রে এখনো পর্যন্ত এই অনুবাদকদের নাম পাওয়া যায় নি। যাঁরা তাঁদের হাতে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহ শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তুলে দিয়েছিলেন, সেকালের হিন্দু সমাজে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবেই সম্ভবত: মিশন কর্তৃপক্ষ অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

সুরথমেধসীয় সম্বাদ সহ উক্ত তিনটি বাংলা গদ্য পুঁথি কেরী গ্রন্থাগারের পুঁথি সংগ্রহে কি করে স্থান পেলো সে বিষয়ে আলোচনার শেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ', 'বেদান্তসার' বা অনুরূপ ধর্ম-দর্শন-পুরাণাদির বঙ্গানুবাদের মুদ্রণ ও প্রকাশনের কোন পরিকল্পনা মিশন কর্তৃপক্ষের ছিল না। মিশন প্রকাশিত পুস্তকাবলীর দীর্ঘ তালিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে সেখানে বাইবেল ছাড়াও বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। এমন কি চার খন্ডে কাশীরাম দাসের মহাভারত (১৮০২), পাঁচ খন্ডে কৃত্তিবাসের রামায়ন (১৮০২), এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত কবিকঙ্কণের চন্ডীমঙ্গলও(১৮১৯) মিশন প্রেস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের একটিও তাঁদের প্রকাশিত পুস্তক-তালিকায় স্থান পায়নি, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ বাইবেল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র এবং দেবদেবীর তীব্র সমালোচনা করাই মিশনের মুখ্য কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়েছিল,- জনসাধারণের জন্য সে গুলি

সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করা নয়। মধ্যযুগীয় তিন কাব্য-মহাভারত, রামায়ণ ও চন্ডীমঙ্গলের আসাধারণ জনপ্রিয়তা ও চাহিদার কথা চিন্তা করে কিছু লাভের আশায় মিশন ঐ তিনটি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বেদ পুরাণ এবং ষড়দর্শনাদি সংগৃহীত হয়েছিল হিন্দুর ধর্মদর্শনকে জানবার জন্য, এবং সেগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রদর্শনের জন্য। ধর্মপ্রচার কালে কথোপকথনে আর অসংখ্য প্রচার পুস্তিকায় পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্মদর্শন ও তার দেবদেবীর বিরোধিতায় ঐ সব পুঁথিপত্র মিশনারিগণের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এর মধ্যে 'বেদান্তসার' বা 'সুরথমেধসীয় সম্বাদের' মত কোন কোনটি বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়েছিল শুধুমাত্র রে: ওয়ার্ডের প্রয়োজনে, তাঁর গ্রন্থে সেগুলির ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতের জন্য।

॥ ৫ ॥

বেদান্তসারের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র আমরা বলেছি যে উক্ত গদ্য পুঁথির ভূমিকা অংশটি অনুবাদকের স্বাধীন রচনা, সদানন্দের বেদান্তসারে ঐ অংশটি নেই। বাংলা অনুবাদ পুঁথির আনুবাদককে অনুসরণ করে রে: ওয়ার্ড সে অংশটি ও যথাযথ অনুবাদ করেছেন। সদানন্দের বেদান্তসারে নেই, এমন অনেক উপমা উদাহরণ এবং ব্যাখ্যামূলক অংশও ঐ গদ্য পুঁথিতে আছে, যা অনুবাদকের সংযোজন। রেঃ ওয়ার্ড তাঁর সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদে সেই অংশগুলিও ক্রমান্বয়ে এবং যথাযথ ভাবে অনুবাদ করেছেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে রেঃ ওয়ার্ড বেদান্ত সারের ঐ বাংলা গদ্য পুঁথিটি ধরেই তাঁর ইংরাজী অনুবাদটি প্রস্তুত করেছিলেন।[১০] 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' গদ্য পুঁথিটির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে সেখানেও পুঁথির অনুবাদক একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা দিয়ে দেবীমাহাত্ম্যের কাহিনী সুরু করেছেন ঃ

> '' পূর্ব্বে জৈমিনি মুনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গমন করিয়া কহিলেন মহাশয় তোমার নিকট আমি ধর্ম্মপ্রস্তাব শ্রবন করিতে আসিয়াছি। বনে সুরথ রাজার সহিত মেধস মুনির যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই কথোপকথন আমি শ্রবন করিতে আসিয়াছি তাহা মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আজ্ঞা কর। পরে জৈমিনিকে মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন এই ক্ষণে আমার কথার সময় নয় কিন্তু তপস্যার সময়।

অতএব আমি যে সময়ে ভাগুরী মুনিকে বিন্ধ্যাচলে ঐ কথা শ্রবন করাই তৎকালে চারি পক্ষী সেই স্থানে ছিল তাহারা শ্রবন করিয়াছে তাহাদিক্কে বল তাহারা তোমাকে শ্রবন করাইবেক।'' (পুঁথির পৃষ্ঠা ১)

মার্কন্ডেয় পুরাণের প্রথমে এই প্রস্তাবনাটি আরো বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়। শ্রী শ্রী চন্ডীর ''ষট্ সংবাদ কথা'র বক্তব্যও অনেকটা এইরূপ। এছাড়া আরো দু'একটি পুরাণে একথা অল্পবিস্তর পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়। রেঃ ওয়ার্ড তাঁর দেবীমাহাত্ম্যের অতি সংক্ষিপ্ত ইংরাজী আনুবাদ "Translation of the substance of the work called Chundee a Khundu of the Markandayu Pooranu"-[১১] তে 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথির অনুবাদককেই অনুসরণ করেছেন :

" Jaiminee, a moonee, went to Markandayu, another moonee, and said,- " O - moonee! I am come to be taught religion by you ; become my teacher,and relate to me the story of King Sooruthu and Madhusu, a moonee. " Markandayu told him that he was now engaged in his tupusya, but that he had told this story to four birds, who would give him all the particulars, and he therefore recommended him to go to them."

হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের একটি নিদর্শন হিসাবে অতি সংক্ষেপে শ্রী শ্রী চন্ডীর কাহিনীটি বিবৃত করাই রেঃ ওয়ার্ডের উদ্দেশ্য ছিল, তাই সেখানে কোথাও তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও নেই। গল্প বলার ছন্দে তিনি বাংলা পুঁথিটির অনুসরণ করেছেন। অনুবাদক লিখেছেন ঃ

পূর্ব্বে দ্বিতীয় মন্বন্তরে চৈত্র বংশোদ্ভব সুরথ মামে সমস্ত ভূমন্ডলের এক রাজা ছিলেন। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রজা প্রতিপালন শাস্ত্রানুসারে করিতেন। কথক দিবসের পর শূকরধ্বংসী কথক লোকেরা সেই রাজার শত্রুতা আচরণ করতো উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র সেই সকল লোকের সহিত অতি প্রবলতর বলশালী সেই রাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল শূকর খাদক কর্তৃক ঐ রাজা পরাজিত হইয়া আপন নগরে আসিয়া নিজ দেশের কর্তা হইয়াছিল। তাহার পর সেই প্রবল শত্রুরা রাজার পুরে আসিয়া ঐ রাজাকে আক্রমণ করিয়া রাজার দুষ্ট বলবান দুরাত্মা আমত্যেদ্দের সহিত মিলিত হইয়া রাজার ভান্ডার ও সৈন্য অপহরণ করিয়া লইল।'' (পু. পৃ- ১-২).

রে ঃ ওয়ার্ডের ভাষায় ঃ

" In the time of the second munoo, a race of kings existed called Choitru, from whom arose Sooruthu, a Very holy King, who cherised his subjects like his childreen. He was an universal monarch : but on a certain occasion a barbarous people, eaters of swine's flesh, invaded his dominions, and took them, leaving to the king only his principal city. After some time these enemies made friends with the kings ministers, and drove him from his capital."

'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' মার্কন্ডেয় পুরাণানুসারে দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর (৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায়) পুর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ। এই পুঁথিটিকে অনুসরণ করলেও রেঃ ওয়ার্ড তাঁর ইংরাজী অনুবাদে কাহিনীকে সংক্ষেপ করতে গিয়ে দেবীর সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা বাদ দিয়েছেন, ব্রহ্মা ও দেবগণের দেবী বন্দনার মর্মবাণীও তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি, এবং পরিশেষে ফলস্তুতি ও রাজা সুরথ আর সমাধি বৈশ্যের তপস্যা ও ঈষ্টলাভ অংশটিও পরিত্যাগ করেছেন। কাহিনীর প্রথমাংশে সুরথ রাজার কথা, তাঁর পরাজয় ও বনগমন, মেধস মুনির আশ্রমে তাঁর আশ্রয় লাভ এবং সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও উপদেশের জন্য উভয়ের মেধস মুনির কাছে গমন পর্যন্ত রেঃ ওয়ার্ডের অনুবাদ প্রায় যথাযথ। কিন্তু তার পর থেকেই কাহিনীকে অতি সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মেধস মুনির বিবৃত মহামায়ার পরিচয় অতিশয় সংক্ষিপ্ত। মধুকৈটভের উৎপত্তি ও ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক তাদের নিধন সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু রেঃ ওয়ার্ড এই দুই অসুরের নাম উল্লেখ করেননি। মহিষাসুর এবং তার সেনাপতিদের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধের বিবরণ তিনি এক কথায় শেষ করেছেন :

" This work, in this place, contain a long account of the dreadful contest which took place betwixt Muha Maya and the usooru, which ended in the destruction of the latter."

চন্ড-মুন্ড , রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে দেবীর সমর কাহিনী তবু কিছুটা বিস্তৃত আকারে বিবৃত হয়েছে। তবে এখানে একথা স্মরণীয় যে রে: ওয়ার্ডই সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় দেবীমাহাত্ম্যের অনুবাদ করেন। উনিশ শতকেই নানা ভাষায় মার্কন্ডেয় চন্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে এফ ইডেন্ পার্জিটার

এবং পরবর্ত্তী কালে মন্মথ নাথ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২৪ সালে Journal Asiatique -এ ফরাসী ভাষায় Burnouf কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত L. Poley এই গ্রন্থটির ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৩১ সালে।[১২] কিন্তু রে: ওয়ার্ড যে কালে এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন গ্রন্থটি পাশ্চাত্য জগতে ছিল প্রায় অপরিচিত -আর তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী নাহলে উনিশ শতকের সূচনা পর্বের সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের আলোচ্য নিদর্শন গুলি পাওয়া যেতনা।

নিজের গ্রন্থে হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণাদির ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার সংযোজনের জন্য সংস্কৃত পুঁথিগুলির বঙ্গানুবাদ যে রে: ওয়ার্ডের প্রয়োজন হয়েছিল, তার আরো প্রমাণ কালিকা পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অধ্যায়ানুসারে স্থূল তর্জমার পুঁথিটি। কালিকা পুরাণের এই স্থূল তর্জমাটি ধরে রে: ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে " Translation of the Substance of the Kalika Pooranu"[১৩] অংশটি রচনা করেছেন। বস্তুতঃ এরকম অধ্যায়ানুসারে স্থূল তর্জমা বা নোট-এর কোন উপযোগিতা নেই, যদি না সেগুলি কোন বিশেষ প্রয়োজনে ফরমাস্ অনুসারে তৈরী করা হয়। রেঃ ওয়ার্ডের উক্ত গ্রন্থে সংযোজিত হিন্দু শাস্ত্র সমূহের বিস্তৃত তালিকা দেখে মনে হয় এরকম অনেক শাস্ত্র-পুরাণাদির বাংলা সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা হয়েছিল। পূর্বে উদ্ধৃত রে: ওয়ার্ডের নিজের বক্তব্য থেকেই অনুমান করা যায় যে, ১৮০০ সাল থেকেই তিনি এজন্য তথ্য সংগ্রহ, পুঁথি সংগ্রহ, পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত পুঁথির বাংলা অনুবাদ অথবা স্থূল তর্জমা করিয়ে গেছেন। তারই সঙ্গে চলেছে নিজের গ্রন্থের জন্য সেগুলির ইংরাজী অনুবাদ ও রচনার কাজ। এখন কালিকা পুরাণের স্থূল তর্জমা আর রে: ওয়ার্ডকৃত তার ইংরাজী ভাবানুবাদের দু'একটি নিদর্শন বিচার করে দেখা যাক্। তর্জমাকার লিখেছেন ঃ

> " ১৪। বিবাহান্তর দেবগণকে বিদায় করিয়া সতীকে বৃষে আরোহন করাইয়া হিমালয়ে উপস্থিত। সেই স্থানে সতীর সহিত মহাদেবের বিবিধ বিহার। নানা স্থানে উভয়ের প্রীতিপূর্ব্বক ভ্রমণ। হিমালয় আগমন ইত্যাদি নানাবিধ নিরূপনং। ১৪।।"

রে: ওয়ার্ড লেখেন :

> " Fourteenth Section : All the gods returned from the marriage of Shivu to their different residence, Shivu, riding on his bull with

Sutee on his knee, proceeds to the mountain Kailasu, arriving at his ashruyu he dismisses all his guests, servants & C., and wanders on the mountain, playing with Sutee : praise of the season spring."

পুনশ্চঃ "৪২। মহাদেবের প্রমথগণ সঙ্গে হিমালয় গমন। হিমালয় সহিত কথোপকথন।। মহাদেবের পরিচর্য্যা নিমিত্ত হিমালয় আপন কন্যা কালীকে পরিচর্য্যার্থে নিয়োগ করিলেন। তারক ভয়ে ভীত দেবগণ কামদেবেরে ধ্যান ভঙ্গের নিমিত্তে মহাদেবের নিকট পাঠাইলেন। ধ্যানভঙ্গে কামদেবের যত্ন। হরকোপানলে কাম দগ্ধ। সেই অগ্নি বাড়বাগ্নি হইয়া সমুদ্রে রহিল। হিমালয় কালীকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন ইত্যাদি।। ৪২ ।।"

রেঃ ওয়ার্ড লেখেন ঃ

" Forty Second Section : Himaluyu delivers his daughter Parvutuee to Shivu, while performing tupusya, to wait upon him ; account of the atrocities of Taruku, an Usooru, who conquered the three worlds ; Shivu, by a beam, darted from his eye in the centre of his forehead, reduced Kundurpu to ashes, for dairing to come to wound him with his arrow in the midst of his tupusya."

দেখা যাচ্ছে যে রেঃ ওয়ার্ড পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার রচনায় স্থূল তর্জমাকে নির্দেশিকা রূপে ব্যবহার করলেও পন্ডিতদের কাছে কাহিনীটি তাঁকে শুনে নিতে হয়েছিল। নির্দেশিকার বাইরে অল্পবিস্তর পরিবর্দ্ধনও লক্ষ্য করা যায়। পন্ডিতদের কাছে কাহিনীটি শুনে নিয়ে কাহিনীর যোগসূত্র এবং পারম্পর্য্য বজায় রাখতে তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী এবং আচার আচরণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রসূত ভুল-ভ্রান্তি তাঁর রচনায় সুপ্রচুর। অধ্যায়গুলি কোনটি সংক্ষিপ্ত কোনটি দীর্ঘ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে , পৌরাণিক কাহিনীর জটিলতা যেখানে তাঁর কাছে কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, সেখানে তাঁর "Substance" একটু দীর্ঘ, যেখানে বোধগম্য হয়নি, সেখানে প্রায় স্থূলতর্জমাটিই তাঁর সম্বল।

॥ ৬ ॥

কিন্তু এই পন্ডিতবৃন্দের পরিচয় কি, যাঁরা রেঃ ওয়ার্ডকে নিত্য তাঁর কাজে সাহায্য করে গেছেন, সংস্কৃত পুঁথির বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন ? দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পন্ডিতদের দেয় অনুদানের হিসাব থেকে এইটুকু শুধু অনুমান করা যায় যে ১৮০০ থেকে ১৮০৬ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের অনুদান প্রাপ্ত প্রায় ৩৫ জন পন্ডিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি, কালিদাস সভাপতি ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। রেঃ ওয়ার্ডের বিশাল গ্রন্থটিতে পুরাণ, জ্যোতিষ ইত্যাদির আলোচনায় শ্রীরামপুর মিশনের এই পন্ডিতবৃন্দের কোন কোন পন্ডিত হয়তো সহায়তা করেছিলেন, কিন্তু ষড়দর্শন তত্ত্বের আলোচনার জন্য তাঁকে যে প্রায়ই কলকাতায় সেকালের অন্যতম বৈদান্তিক পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেতে হয়েছে, সে কথা তাঁর জার্নাল পাঠে জানা যাচ্ছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৬, জার্নালে তিনি লেখেন ঃ

> " Yesterday at Calcutta I was writing with the Head Sanskrit Pundit of the College. I am anxious to get from him an intelligible and genuin account of the Hindoo Philosophy."

পুনশ্চ, ৯ই মার্চ ১৯০৬, লেখেন ঃ

> " Yesterday I was at Calcutta, writing an account of the Hindoo Philosophy with the Head Pundit of the College....."

এই কলেজ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এবং এই হেড্ পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের এরকম আরো খবর রেঃ ওয়ার্ডের জার্নালে আছে। ১৮০৩ সালে রচিত বেদান্তসারের বাংলা অনুবাদ পুঁথিটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তা নিশ্চিত রূপে জানা যায়নি। কিন্তু পুঁথি যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক, ষড়দর্শনের আলোচনায় এবং অদ্বৈত বেদান্তের এই বিখ্যাত প্রকরণ গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদের প্রাক্কালে রেঃ ওয়ার্ড যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উপদেশ ও সহায়তা লাভ করেছিলেন, তাঁর জার্নাল পাঠে সে কথাই মনে হয়।

'বেদান্তসার' গদ্য পুঁথিটির পাঠকের কৌতুহলী হবার আরো কারণ আছে। এই

গদ্য পুঁথিটির ভূমিকা অংশে বর্ণিত অনুবাদকের স্বাধীন বক্তব্যটুকু বাদে সমগ্র পুঁথিটির গদ্যভাষা পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের শাস্ত্রালোচনার গদ্যভাষার অতিশয় নিকটবর্তী। পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রালোচনার সাধু গদ্যে যেমন সংস্কৃত গদ্যের বিন্যাস পদ্ধতি, সমাস সন্ধিবদ্ধ সংহত বাক্যগঠন, সংস্কৃতগন্ধী পদসন্ধান ও পদান্বয়, প্রশ্নোত্তর মূলক আলোচনাধর্মী বাক্‌পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, বেদান্তসারের সংস্কৃত প্রধান সাধু গদ্যভাষা যেন তারই প্রতিরূপ। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয়ের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই উপস্থিত, এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করার কারণ এই যে সমসাময়িক কালে প্রকাশিত অন্যান্য লেখকবৃন্দের গ্রন্থে ও আইন বিষয়ক রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে এর দু-একটি চোখে পড়লেও মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাবলীতেই এদের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। বেদান্তসারের গদ্যভাষাতেও নিম্নে আলোচিত পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এখানে তাদের দু'একটি করে নিদর্শন আলোচনা করে দেখা যাক ঃ

১) 'হইতে' বা 'থেকে' বোঝাতে মৃত্যুঞ্জয় 'আদি' বা 'অবধি' শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন, 'সূর্য্যোদয় কালাবধি মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত', 'মধাহ্নকালাবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত' (বত্রিশ সিংহাসন, মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃ :২৯), 'এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়' (রাজবলী, ঐ পৃ ১১৯), 'ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত' (বেদান্ত চন্দ্রিকা, ঐ, পৃ ১৯৩) ইত্যাদি। 'বেদান্তসার' গদ্য পুঁথিটিতেও 'আদি' বা অবধি শব্দের এরূপ ব্যবহার সুপ্রচুর। যেমন, ''আনন্দময়াদি অন্নময় পর্য্যন্ত যে পাঁচ ইহারা আত্মার আচ্ছাদক হয় ''(পুঁথির পৃষ্ঠা ১৮), 'বিশ্ববৈশ্বানর অবধি ঈশ্বর পর্য্যন্ত যে চৈতন্য এ সকল এক' (পুঁথির পৃ : ১৯), পুত্রাদি শূণ্য পর্য্যন্ত যে সকল ইহারা আত্মা নয়।' (পুঁথির পৃ ২২), ইত্যাদি।

২) সংস্কৃত প্রধান সাধু গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে 'করিয়া' শব্দটিকে যেন একটি বাড়তি ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করেন। প্রকৃত পক্ষে এই 'করিয়া' শব্দটি 'রূপে' অর্থেই যেন ব্যবহৃত হয়। যেমন, ''আত্মশরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন'' (বত্রিশ সিংহাসন, ঐ পৃ: ১৬), ''এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে'' (বত্রিশসিংহাসন, ঐ পৃ:২১),

সেই দানকে সাত্বিক করিয়া পন্ডিতেরা জানেন'' (হিতোপদেশ, ঐ, পৃ: ৫৪), ''ধনাদিদ্বারা যে মেল হয় তাহাকে উপহার করিয়া বলি'' (হিতোপদেশ, ঐ, পৃ ১১৩), ''অতএব তাহাকে সকলে রাক্ষসী করিয়া কহিত'' (রাজাবলী ঐ পৃ ১৩৯), 'তাহাকে সকলে নাসিরুদ্দিন করিয়া কহিত (রাজাবলী, ঐ পৃ: ১৫৮), ইত্যাদি।

'বেদান্তসার' এর অনুবাদকও 'করিয়া' শব্দটি এই ক্ষুদ্র পুঁথিটির বহু বাক্যে অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন ''অতএব সর্ব্বশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে বিশ্বাত্মা করিয়া বলে'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ:৬), ''নানাজাতীয় বৃক্ষসমূহকে এক বন করিয়া বলিতেছি'' (বেদান্তসার, পৃ:৮), ''এই দুই প্রকারে অন্ত:করণকে দুই করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, (ঐ পুঁথির পৃ: ১৩) ''তন্ময়ত্ব কিনা তৎপ্রধানকত্ব তৎপ্রযুক্তস্বপ্ন করিয়া বলি'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ:১৫) ''এই সকলকে নিয়ম করিয়া বলি'' (বেদান্তসার পুঁথি পৃ: ২৯), ইত্যাদি।

৩) পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় 'জন্য' অর্থে 'প্রযুক্ত' শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর সকল রচনাতেই এরকম প্রয়োগের নিদর্শন প্রচুর দেখা যাবে। যেমন, ''এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন'' (বত্রিশ সিংহাসন, ঐ, পৃ:৪), 'এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরে কন্দর্প দর্প করে (বত্রিশ সিংহাসন, ঐ, পৃ: ২১), ''অদৃষ্ট প্রযুক্ত হয় ইহা কাপুরুষেরা কহে'' (হিতোপদেশ, ঐ, পৃ:৫২), ''তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ঔরস সন্তান হইল না'' (রাজাবলী, ঐ পৃ:১২০), ''তথাপি এতদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়তি কুমুদভ্রান্তং ..... ''(বেদান্তচন্দ্রিকা'' ঐ, পৃ: ২২৫) ; ইত্যাদি।

'বেদান্তসার' এর অনুবাদক উক্ত পুঁথিটিতে অসংখ্যবার 'প্রযুক্ত' শব্দটিকে অনুরূপ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যেমন, ''অচেতনের যে চেতন ব্যবহার সে চেতনাধিষ্ঠান প্রযুক্তই হয়'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ ৬), ''এই সর্পভিন্ন যে রজ্জু তাহাতে অজ্ঞান প্রযুক্ত জেমন সর্পজ্ঞান হয়'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ:৭), ''অতএব তাহার জড়তা প্রযুক্ত তৎকার্য্য আকাশাদির জড়তা হয়'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ:১২), '' ইহাকে জাগদ্বাসনাময়ত্ব প্রযুক্ত স্বপ্ন করিয়াও বলি'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ:১৬), ইত্যাদি।

৪) পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অকারান্ত শব্দের ওকারান্ত ব্যবহার।

যেমন, 'প্রত্যক্ষতো', 'বশতো', 'হইবো' 'করো' ইত্যাদি। ''কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে'' (বত্রিশ সিংহাসন, ঐ, পৃ: ৪৭), ''নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রথমতো যুদ্ধার্থ মহারাজ মোহনলালকে সসৈন্যে পাঠাইলেন'' (রাজাবলী, ঐ, পৃ: ১৮৪),''... অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছিলো ও তাহার যে প্রতিফল পাইয়াছিলো তাহা কি তোমরা শুনাই'' বেদান্তচন্দ্রিকা, ঐ পৃ: ২১৩), ইত্যাদি।

বেদান্তসারের অনুবাদকও লেখেন, ''সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরকে পাইবো এতাদৃশ যে উৎকট ইচ্ছা....'' (বেদান্তসার পুঁথি পৃ:৫), ''তাহাও ব্রহ্মব্যাতিরেকে কেহো নয়।'' (বেদান্তসার পুঁথি, পৃ:৭), অজ্ঞানের কার্য্য যে জগৎ তাহা প্রতক্ষো দেখিতেছি (ঐ, পৃ:৭), ''সে ফলতো, রজ্জুমাত্র'' (পুঃ পৃ' ২২)।

৫) ধর্ম, দর্শন ও নীতি তত্ত্বের আলোচনায় পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় এক বিশিষ্ট আলোচনা ধর্মী প্রশ্নোত্তর মূলক বাক্‌রীতি গ্রহণ করেছিলেন, নানা প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারনায় যে বাকরীতিকে বিশ্লেষনধর্মীও বলা যেতে পারে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' গ্রন্থেই তাঁর এই বিশিষ্ট শাস্ত্রলোচনার ভাষারীতির সর্বাধিক নিদর্শন লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই বাকরীতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তা প্রধানত: রূপ পেয়েছে কয়েকটি বিশেষ নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় পদ বা Correlatives এর বিশিষ্ট প্রয়োগের ফলে। এই নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় পদগুলি ঠিক 'যাহা....তাহা' 'যে....সে' ইত্যাদির মত সরল নয়, বরং অন্য পদের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। রচনাকে আলোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী করে তুলতেই যেন মৃত্যুঞ্জয় লেখেন, 'তবে যে.....সে কেবল', 'তবে যে.....তাহা', যদি বল....তবে'',' যে....সে কেবল','কে....যে', ইত্যাদি। এছাড়া প্রশ্নবোধক 'কি', 'কেননা' ইত্যাদি পদ বা পদযুগলের প্রয়োগও তাঁর এই বিশিষ্ট রীতিরই অঙ্গ। যেমন, মৃত্যুঞ্জয় লেখেন- 'তবে যে শাস্ত্রেতে উপাসনার অবলম্বনের বিশেষোপদেশ সে কেবল উপাসকদের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ'' (বেদান্ত চন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, পৃ ২০৩)। ''... যদি বল আকাশপতিতাগত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল কিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি,'' (বত্রিশ সিংহাসন, ঐ, পৃ ৪৭), ''আমি যে অপ্রামানিক

বাক্যসকল কহিয়াছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ'' (বত্রিশ সিংহাসন, ঐ, পৃ ৪৩), ''অতিশয় মায়াপটু এ চমৎকৃত নর্তক কে যে দুর্জন কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে'' (হিতোপদেশ, ঐ, পঃ ৮৫), ''যে হেতুক কার্য্যসকল সিদ্ধ হয় মনোরথমাত্রেতেই হয়না কেননা সুপ্তসিংহের মুখেতে মৃগেরা প্রবেশ করেনা'' (হিতোপদেশ, ঐ, পৃঃ৫২), ইত্যাদি।

'বেদান্তসার'-এর অনুবাদকের ভাষাতেও এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটির পরিচয় পাওয়া যায়। মুল গ্রন্থের ভাষারীতি তাঁকে হয়তো এ বিষয়ে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তাঁর পদনির্বাচন ও প্রয়োগ কৌশল পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃত্যুঞ্জয়ের মতই 'বেদান্তসার' এর অনুবাদক লেখেন, ''জেমন রজ্জুবিবর্ত্ত যে সর্প সে ফলতো রজ্জুমাত্র তবে যে সর্পজ্ঞান হয় সে কেবল ভ্রম (বেদান্তসার পুঁথি, পৃঃ২২), ''যদি বল সুসুপ্তিতে সুখ নাই তবে সুসুপ্তির নিমিত্তে উত্তম শয়নাদি সম্পাদন লোকে কেন করে'' (ঐ, পুঃ পৃঃ ৯), ''তবে যে মনুষ্যাদিরা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে তাহা চেতন রূপী পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানেতে হয়'' (ঐ পুঃ পৃঃ ১১), ''আমি তুমি ঞিনি তিনি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ যে ভেদ ব্যবহার সে কেবল অহঙ্কারমূলক দেহেন্দ্রিয়রূপ উপাধিনিমিত্তক'' (ঐ পুঃ পৃঃ৬), ''সেই অন্তঃকরণ ব্যাপারভেদে চারি। কি কি। বুদ্ধি মন অহঙ্কার চিত্ত'' (ঐ,পু পৃঃ ১৩), ''দ্বিতীয়ানুবন্ধ সে কি সকল বেদান্তের তাৎপর্য্যার্থরূপ জীবব্রহ্মের ঐক্য'' (ঐ পুঃ পৃঃ ৬), ''তাহা হইতে পারেনা কেননা এ বাক্যেতে গঙ্গা আর যে ঘোষ ইহার আধার আধেয় ভাব অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়'' (ঐ পুঃ পৃ ২৫), ইত্যাদি।

৬) পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে ব্যাকরণ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যগঠন বিষয়ে ব্যাকরণের বিবিধ সূত্রের বিবরণ দিয়ে গ্রন্থের প্রথম স্তবকের পঞ্চম কুসুমে আচার্য দন্ডিকৃত কাব্যাদর্শের অনুসরণে তিনি গদ্যের বিবরণ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন বিবিধ ন্যায়ের বিবরণ। সে গুলি হল অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়, অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়, গতানুগতিক ন্যায়, বকান্ডপ্রত্যাশার কথা, অন্ধহস্তিদর্শনের কথা, দশম ন্যায়, অন্ধপঙ্গুন্যায়, নষ্টাশ্ব দগ্ধরথ ন্যায় এবং লাজাবন্ধন ন্যায়। ধর্মদর্শনে নীতিশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পান্ডিত্য ছিল আসাধারণ। প্রাচীন দর্শন ও নীতি শাস্ত্রের ভান্ডার থেকেই হয়তো তিনি এই সব-ন্যায়ের

বিবরণ সংগ্রহ করে থাকবেন। এই 'ন্যায়' বা 'কথা' গুলি এক একটি গভীরার্থদ্যোতক নীতি উপদেশমূলক কাহিনী, সংসার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত সত্যই এদের ভিত্তি। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠে মনে হয় যে গদ্যকে মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রচনায় উপযুক্ত স্থানে এই সব ন্যায় বা কথার প্রয়োগ মৃত্যুঞ্জয় বিশেষ ভাবে অনুমোদন করেছেন। কাহিনীগুলি যে তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষত বত্রিশসিংহাসন ও বেদান্তচন্দ্রিকায় এই সব ন্যায় বা কথার ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে। মৃত্যুঞ্জয় ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক বৃন্দের রচনায় বা সমকালীন (১৮০০-১৮১৮) অন্য কোন লেখকের রচনায় এই বিশিষ্ট রীতির পরিচয় মেলে না। কিছুকাল পরে, ১৮২৩ সালে রামমোহনের 'চারি প্রশ্ন'—এর উত্তরে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ''পাষন্ডপীড়ন'' রচনা করেন, তাতে এরকম কিছু ন্যায়ের প্রয়োগ দেখা যায়। তাই আমাদের মনে হয়েছে কাহিনী বা প্রবন্ধের মধ্যে এবংবিধ ন্যায় বা কথার উল্লেখ করে রচনাকে সরস, কিন্তু তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ ধর্মী এবং কখনো কখনো তীব্র আক্রমণাত্মক করে তোলা সমকালে পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়েরই বিশিষ্ট রীতি ছিল। আর কৌতূহলের বিষয় এই যে 'বেদান্তসার'-এর অনুবাদক বেদান্ত ব্যাখ্যায় মৃত্যুঞ্জয় বর্ণিত 'নষ্টাশ্বদগ্ধরথ' ন্যায়ের বিবরণ উপমা হিসাবে যেন মৃত্যুঞ্জয়ী ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করেছেন।

'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র প্রথম স্তবকের পঞ্চম কুসুমে 'নষ্টাশ্বদগ্ধরথ' ন্যায়ের বিবরণ দিতে গিয়ে পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় লেখেনঃ

''নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়ের বিস্তার। দুইজন রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে প্রবৃষ্ট হইলে দৈবাৎ সেই কাননের মধ্যে দাবানলেতে একজনের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল অন্য ব্যক্তির অশ্ব পুড়িয়া মরিল রথ থাকিল। এতদ্রূপে একজন নষ্টাশ্ব অন্য জন দগ্ধরথ হইয়া অটবীতে থাকে একদিবস দৈবাৎ দুইজনেতে দেখা হইল। অনন্তর উভয়ে যুক্তি করিয়া একজনের রথেতে অন্যের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্যদেশ পাইল। এবম্বিধ ন্যায়ে মনুষ্যেরা নিষ্কাম শুদ্ধ কর্ম্মরূপ রথেতে সংযোজিত পরমেশ্বর স্বরূপ জ্ঞান রূপ হয়েতে আরোহন করিয়া অনায়াসে পরম সুখেতে অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে ইহা প্রাচীন বেদান্তিরা কহিয়াছেন।'' (প্রবোধ চন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় সং, পৃঃ ২৪২)।

পুনরায় ''বেদান্তচন্দ্রিকা'' গ্রন্থে মোক্ষ প্রাপ্তির পথে জ্ঞান ও কর্মযোগের ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

> ''শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যকর্ত্তার পূর্ব্বে যে সকল ভাষ্যকর্ত্তা তাহারদের ও বেদান্তবর্তিকাকারেরও মতে নষ্টাশ্ব দগ্ধরথ ন্যায়ে অর্থাৎ যেমন একজন নষ্টাশ্ব অথচ বিদ্যমান রথ ও অন্য একজন দগ্ধরথ অথচ বিদ্যমানাশ্ব এই দুইজনের মধ্যে যে বিদ্যমান রথমাত্র তাহার গন্তব্যপ্রাপ্তি হইতে পারে না বর্তমানাশ্ব ব্যক্তির কিছু কষ্টে গন্তব্যপ্রাপ্তি হইতে পারে ইহাতে উভয়ের একযোগে অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্যপ্রাপ্তি হয়। তেমনি অশুক্লকৃষ্ণাক্ষ্য কর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের সমুচ্চয়েতে অনায়াসে সুখেতে মুমুক্ষুর গন্তব্য মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অতএব তাহারদেরো মতে তত্ত্বজ্ঞান কালেও কর্ম্মস্বরূপ ত্যাগ নাহি।''
> (বেদান্তচন্দ্রিকা, মৃত্যঞ্জয় গ্রন্থাবলী, ঐ, পৃ: ১৯৫)

১৮০৩ সালে রচিত 'বেদান্তসার' -এর অনুবাদকও উক্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যায় লেখেনঃ-

> ''শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে যে ভাষ্যকার সকল তাঁহাদ্দের মত কর্ম্মের সরূপত পরিত্যাগ কখন নাই কিন্তু কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ যে ফল তাহারি পরিত্যাগ অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেক সে কর্ম্মের ফলানুসন্ধান না করিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্তে দেববিহিত সকল কর্ম্মই করিবেক এইরূপে জ্ঞান ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ হন।। জেমন নষ্টাশ্বদগ্বরথের দেশান্তর প্রাপ্তি। তাহার বিবরণ দুই পুরুষ দুই রথে আরোহন করিয়া কোন দেশে যাইতেছিল পথমধ্যে এক পুরুষের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল দ্বিতীয় পুরুষের অশ্ব নষ্ট হইল রথ থাকিল। সেই দুই পুরুষ যুক্তি করিয়া এক পুরুষের অশ্বকে অন্যের রথেতে যোজনা করিয়া অনায়াসে প্রাপ্তব্য দেশকে পাইল। এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যিনি কর্ম্মমাত্র করেন তিনি নষ্টাশ্ব পুরুষের ন্যায়। যাঁহার জ্ঞান মাত্র সে দগ্বরথ পুরুষের ন্যায়। ঈশ্বর প্রাপ্তি দেশান্তর প্রাপ্তির ন্যায়। যদ্যাপি দগ্বরথ পুরুষ কেবল অশ্ববারা দেশান্তর পাইতে পারে তথাপি অশ্বযুক্ত রথেতে জেমন সুখেতে দেশান্তর প্রাপ্তি হয় তেমন কেবল অশ্বেতে হয়না। নষ্টাশ্ব পুরুষের দেশান্তর প্রাপ্তি অতি দুষ্কর। এই ন্যায়েতে ফলানুসন্ধানরহিত কর্ম্মসহকারে তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ হন।''

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সদানন্দ যোগীন্দ্রের মূল বেদান্তসার গ্রন্থে মোক্ষের পথে জ্ঞান ও কর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে নষ্টাশ্বদগ্বরথের দেশান্তর প্রাপ্তির উপমা নেই, এ ব্যাখ্যা অনুবাদককৃত। এ ছাড়াও পঞ্চীকরণ, অধ্যারোপ, নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, অধিকারী, অন্নময় কোষ, লক্ষণা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সঙ্গাবাচক ও

নিগূঢ়ার্থক শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা সদানন্দ তাঁর গ্রন্থে দেননি। অনুবাদক প্রয়োজনীয় উদাহরণ সহযোগে ছাত্রদের বোঝ্‌বার উপযোগী করে সেগুলি যেন ব্যাখ্যা করে বলেছেন। আর পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তত্ত্বদর্শনই হোক্, অথবা কাহিনীই হোক্ অনুবাদকালে বিষয়কে ব্যাখ্যামূলক বা বর্ণনাধর্মী করে পরিবেশন করা পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়েরই বৈশিষ্ট্য। বত্রিশসিংহাসনের অনুবাদেও তিনি এরকম স্বাধীনতা গ্রহণ করে কিছু কিছু নূতন তথ্য যোগ করেছেন এবং কাহিনীকে নিজের মত করে বলেছেন। [১৪].

৭) পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সংস্কৃত বহুল সাধু গদ্য ভাষায় মাঝে মাঝে দু'একটি চলিত্ ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহার। তাঁর সমসাময়িক কোন কোন রচয়িতার রচনাতেও অবশ্য এ বৈশিষ্ট্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়, তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু বিশেষত্ব আছে। মৃত্যুঞ্জয় 'হইবে'-এর পরিবর্তে 'হবে', 'নহে'-এর পরিবর্তে 'নয়', 'তাহার'-এর পরিবর্তে 'তার', 'যাহার'-এর পরিবর্তে 'যার'– ইত্যাদি চলিত্ শব্দ তাঁর সব রচনাতেই অসংখ্যবার ব্যবহার করেছেন। সমসাময়িক অপর রচয়িতাগণের রচনায় এরকম চলিত্ শব্দের ব্যবহার আছে, তবে তা এত ঘন ঘন ও অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হয় নি। তাই অতিশয় সংস্কৃতানুসারী সাধুগদ্যের মধ্যেও চলিত্ শব্দের এরূপ ব্যবহার পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়। এছাড়াও তাঁর বত্রিশ সিংহাসনে 'দাও'-এর পরিবর্তে 'দেও', 'নিম্নে'-এর পরিবর্তে 'নামোতে', 'যাইলে'-এর পরিবর্তে 'গেলে', 'পাইবো'-এর পরিবর্তে 'পাবো', 'করিবার'-এর পরিবর্তে 'করবার' ইত্যাদি যথেচ্ছ চলিত্ শব্দের ব্যবহার আছে। হিতোপদেশ, রাজাবলী এমনকি বেদান্তচন্দ্রিকার মত অতিশয় সংস্কৃতানুসারী সাধু গদ্যভাষাতেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ''কিংবা''-এর পরিবর্তে প্রায় সর্বদাই ''কিম্বা'' লেখেন। তাছাড়া ''কেননা'' ''ভালনয়'' ইত্যাদি কিছু শব্দ বা শব্দ যুগলের প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি লক্ষ্য করা যায় - এও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুঞ্জয় লেখেন : ''এমত পূণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে'' বত্রিশ সিংহাসন, মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৬)। ''এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকের নয় এবং মন্ত্রীর নয়'' (ঐ, পৃ: ১)। ''যে পুত্র পন্ডিত ও ধার্ম্মিক নয়'' (হতোপদেশ, পৃ: ৫১)। ''ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু ঘটপটাদিবৎ লৌকিক বস্তু নয়।'' (বেদান্তচন্দ্রিকা ঐ, পৃ:২০৮)। '' যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব'', (বত্রিশসিংহাসন, ঐ, পৃ: ১৭)। '' তারপর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত'', (রাজাবলী ঐ, পৃ: ১১৯)।

''শয়নাসনভোজনাদির ন্যায় লৌকিক নয় যে যার যেমন ইচছা তেমনি করিবে। কিন্তু যার যে শাস্ত্র সে শাস্ত্রতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয়'', (বেদান্তচন্দ্রিকা, ঐ, পৃ: ২০৮)। ''তুমি কি আকাশপতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিত বংশজাত'', (বত্রিশসিংহাসন, ঐ, ৪৭)। ''যেহেতু জল কিম্বা অগ্নি কিম্বা বিষ কিম্বা শাস্ত্র কিম্বা ক্ষুধারোগ কিম্বা পর্ব্বত হইতে পতন ইত্যাদি যৎকিঞ্চিত নিমিত্ত পাইয়া জীব প্রাণত্যাগ করে'', (হিতোপদেশ, ঐ, পৃ: ৬৫)। ''আমার বয়:ক্রমেতে দুইশূন্য পড়িয়াছে সে ভালনয়'', (বত্রিশসিংহাসন, ঐ, পৃ ৬)। ''সে পরামর্শ ভালনয় ইহা বুঝিয়া....'', (রাজাবলী, ঐ, ১৬২)। ''তাহার উপেক্ষা করা ভালনা, (হিতোপদেশ, ঐ, ৮২) ইত্যাদি।

বেদান্তসারের অনুবাদকও তাঁর ক্ষুদ্র রচনাটিতে পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের মতই উক্ত চলিত্ শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। তিনিও বহুবার লেখেন : ''যে সকল জগৎ হইয়াছে আছে হবে সে সকলি ব্রহ্মস্বরূপ'', (বেদান্তসার, পুঁথির পৃ: ২)। ''অতএব জ্ঞানের অভাবরূপ এ অজ্ঞান নয়,'' (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ৮)। ''সে সুখ সুসুপ্তিকালীন সুখ নয়'', (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ৯)। ''তার জন্য অন্যবিষয়ের জ্ঞান কেন না হয়,'' (বেদান্তসার, পুঁ পৃ ৯)। ''যে যার যোগ্য সেইরূপে তাহাকে বর্ণন করিলেন'', (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ১৫)। ''যে যার হয় সে তানয় জেমন রাজার ধন রাজা নন'', (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ৮)। ''বনের ন্যায় কিম্বা জলাশয়ের ন্যায়,'' (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ১৭)। ''বৃক্ষের ন্যায় কিম্বা জলের ন্যায়,'' (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ১৭)। ''সে ভাল নয় কেননা,'' (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ৪)। ''তাহা কখন ভাল নয়,'' (বেদান্তসার, পুঁ পৃ: ১১)। ''....এই সকলের বিনাশ হয় তাতে করে....'' (বেদান্তসার, পুঁ, পৃ: ৩০) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুতরাং ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, বিশিষ্ট প্রয়োগ ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বিচার করে মনে হয় যে ''বেদান্তসার'' গদ্য পুঁথিটির ভূমিকা বাদে অনুবাদ অংশটি পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত একটি ছাত্রপাঠ্য "Note" হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। নাটোরে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে মৃত্যুঞ্জয় পরিণত যৌবনে, সম্ভবত: অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের কোন সময়ে কলিকাতায় আসেন এবং টোল খুলে ছাত্র পড়াতে সুরু করেন। রে: ওয়ার্ড জানিয়েছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের চতষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র ছিল। রামমোহন বলেছেন, তাঁর টোলে মূল উপনিষদ ও তার শাঙ্করভাষ্য এবং বেদান্তসূত্র ও তার ভাষ্যের পুঁথি ছিল। পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই তাঁর

টোলে বেদান্তদর্শন, ন্যায়দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিবিধ বিদ্যার অধ্যাপনা করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদ্যৎমহলে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের খ্যাতিই উইলিয়াম কেরীকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেজন্যই তিনি পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে ১৮০১ সালে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের 'পান্ডিত্য কর্ম্মে' নিয়ে আসেন। বেদান্তের অধ্যাপনায় সদানন্দ যোগীন্দ্রের 'বেদান্তসার' একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রদের পঠন পাঠনের জন্য উক্ত প্রকরণ গ্রন্থটির একটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ প্রস্তুত করা যেমন মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, তেমনি অসম্ভব ছিল না, তাঁর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরই কোন ছাত্রের মাধ্যমে সেটি শ্রীরামপুরের মিশনারিবৃন্দের হস্তগত হওয়া। আর একথাও আমরা জানি যে আনুমানিক ১৮০০ সালের পর থেকেই মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিবৃন্দের খুবই কাছের মানুষ।

রে: ওয়ার্ডের "Account of the Writings Religions and Manners of the Hindoos...." গ্রন্থটি রচনায় পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদান প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ একই সময়ে অনুরূপ বিষয়ে একখানি মৌলিক বাংলা গ্রন্থ রচনা করছিলেন। তাতে হিন্দুজাতির সমকালীন আচার আচরণ বৈদিক কালের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় কিছু প্রাসঙ্গিক অনুবাদ সহ পরিবেশিত হয়েছিল। পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের উপযুক্ত গ্রন্থই বটে! ১৮০৫ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুঞ্জয় সম্ভবত: এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। কিন্তু গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, পান্ডুলিপির ও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুধু ১৮০৫ সালের ২৬শে জুলাই অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যকরী সভার বিবরণীতেই এর একটি সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় :

"Preparing for the press : A view of manners and customs of the Hindoos as they exist at the present time ; in which many popular translations as contrasted with the ancient observations presented by the Vedus ; an original work in Bengali Language, Compounded by Mritoonjoy Vidyalamkar, head pundit in the Sanskrit and Bengali Language in the College of F. W."[১৫]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিবরণীতে উল্লেখিত এই "press" সম্ভবত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসই এই সময়ে কলেজের পুস্তকপুস্তিকা মুদ্রিত করতেন এবং রে: ওয়ার্ড ছিলেন সেই প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক।

অপর পক্ষে, শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। উইলিয়াম কেরী ও জসুয়া মার্সম্যান তাঁর কাছে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। কেরী সাহেবের নানা গ্রন্থরচনায় তাঁর পরোক্ষ আবদানের কথাও সকলে জানেন, তাঁদের সম্পর্ক ছিল অতিশয় হৃদ্যতাপূর্ণ। কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড এবং জন ক্লার্ক মার্সম্যান বিভিন্ন সময়ে এই মুক্তমতি শাস্ত্রবিৎ পন্ডিতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করেছেন। ভারতের ইতিহাসের পরিচয় দিতে গিয়ে রে: ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থের প্রথম খন্ডে সংযোজিত করেছেন মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলী গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। তাই হিন্দুর তত্ত্বদর্শন ও আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় রে: ওয়ার্ড যে মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তা প্রার্থনা করবেন, এবং মৃত্যুঞ্জও যে তাঁকে সর্ববিধ সহায়তা দিতে কার্পণ্য করবেন না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জর্নালে উক্ত রে: ওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিগুলি থেকে, সংস্কৃত পুঁথির বঙ্গানুবাদে মৃত্যুঞ্জয়ের আর কোন অবদান ছিল কিনা তা জানা যায় না। আর, পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রে: ওয়ার্ডকে তাঁর প্রার্থিত "an intelligible and genuine account of Hindoo Philosophy" দিলেও রে: ওয়ার্ডের গ্রন্থপাঠে দেখা যাবে যে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেননি। যুক্তি, তর্ক ও বিশিষ্ট শব্দাবলীর বিশেষার্থের আবরণময় ষড়দর্শনের মর্ম্মবাণী উপলব্ধি করে, তা ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করার মত না ছিল তাঁর বাংলা ভাষাজ্ঞান না তত্ত্বদর্শনে অধিকার। আর তিনি ছিলেন হিন্দুর ধর্ম্মদর্শনের অসারত্ব প্রমাণেই অধিক উৎসাহী। সঙ্গত কারনেই H. T. Colebrooke ইংরাজীতে রে: ওয়ার্ডকৃত ''বেদান্তসার''-এর অনুবাদ পাঠ করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

" I wish to speak as gently as I can of Mr. Ward's performance ; but having Collated this, I am bound to say it is no version of the original text, and seems to have been made from an oral exposition through the medium of a different language, probably the Bengalese. This will be evident to the oriental scholar on the slightest comparison; for example, the introduction, which does not correspond the original in so much as a single word, the name of the anthor's preceptor alone excepted ; nor is there a word of the translated introduction countenanced by any of the Commentaries...." etc. etc.[১৬]

রে: ওয়ার্ডের ভ্রান্তিপ্রবণতার কারণ ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপন্ডিত মি: কোলব্রুক যথার্থই অনুমান করেছিলেন। শুধু 'বেদান্তসার' এর ইংরাজী অনুবাদেই

নয়, এ ত্রুটি তাঁর গ্রন্থের সব অনুবাদগুলিতেই সমপরিমাণে বিদ্যমান।

॥ ৭ ॥

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা বলেছি যে 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' একটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। উদ্দেশ্যমূলক রচনা হলেও উনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণের আরো একটি গদ্য নিদর্শন হিসাবে এর কিছু মূল্য আছে। তাই এখানে পুঁথিটির ভাষা ও রচনাভঙ্গির সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

লেখকের ভাষা ব্যবহারের একটা নিজস্ব রীতি থাকে, সে ভাষা বিশ্লেষণ করে তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সুরথমেধসীয় সম্বাদ যে কালের রচনা (১৮০২-১৮০৪), সে কাল ছিল সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের নির্ম্মাণ যুগ, আদর্শ-সন্ধানের যুগ। যে পূর্ণতা ভাষাকে দেয় নিখিল ভাবরাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে নিঃসঙ্কোচে সম্প্রসারিত হবার স্বাধীনতা, বাংলা গদ্য তখনো সে পুর্ণতা অর্জন করেনি। তখনো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল ও নানা অনুবাদ গ্রন্থ রচয়িতা পন্ডিত ও মিশনারিবৃন্দ অন্বেষণ করছেন বাংলা গদ্যের সেই রাজপথ, অনতিকাল পরেই যে পথে বহু স্রষ্টা অবাধে পদচারণা করবেন, তাঁদের অনুশীলন ও পরিমার্জনায় যে পথ হবে নব্যভাবনায় ভাবিত জাতির ভাবমুক্তির পথ। তাই আলোচ্য রচনায় যাকে বলে "Style", তার অন্বেষণ বোধহয় নিরর্থক। এ কথা মনে রেখে শব্দ ও শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে অনুবাদকের নিজস্ব রুচি, বাক্যগঠনের বিশেষত্ব, এবং কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের অন্বেষণ করা যাক্।

সুরথমেধসীয় সম্বাদ দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর অনুবাদ, অনুবাদক স্পষ্টতঃই পুরাণকারের ভাষা ও রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি শব্দ চয়ন ও পদসংস্থাপনে মূলেরই অনুসরণ করেছেন, এবং দেবীর স্তব ও বন্দনা অংশগুলিতে তাঁর এই সংস্কৃতানুসারিতা অধিকতর প্রকট হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তৎসম শব্দের প্রতি অনুবাদকের যে আসক্তি দেখা যায়, তা মূলের ভাষার উপর এই অতিশয় নির্ভরতার জন্যই। মূল সংস্কৃত শ্লোক থেকে শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ চয়ন করে অনুবাদক প্রায় সর্বদাই নিজের অনুবাদে তাদের সংস্থাপন করেছেন, কোথাও বেশী কোথাও কম। ফলে তাঁর অনুবাদের ভাষা হয়ে পড়েছে সংস্কৃতগন্ধী সাধুগদ্য। তৎসম শব্দের আধিক্য থাকলেই যে বাংলা গদ্যভাষা দুর্বোধ্য হবে বা অসুন্দর হবে, এমন আমাদের বক্তব্য নয়। কিন্তু অনুবাদে ভাষার ক্ষেত্রে মূলানুগত্যের ও একটা সীমা থাকে। অনুবাদক দেখবেন, পাঠক যাতে মনে না করেন যে তিনি সংস্কৃত পড়ছেন। কিন্তু আলোচ্য অনুবাদে

অনুবাদক বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের সেই সীমারেখা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না এ সেই বাংলা গদ্যের নির্মান যুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য। আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্যে স্থানে স্থানে তাঁর গদ্যভাষা মন্থর ও শব্দ সজ্জায় বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে'দৌর্ম্মনস্য','নিরাকৃত','সন্নঙ্গ', 'অমরারি','বিনির্ধূত','স্যান্দন', 'বিপোথিত',' বক্ত্র', 'নাগ' (হস্তি অর্থে), - এমন বহু সংস্কৃত শব্দ তাঁর অনুবাদে নিয়তই সার্থক দ্যোতনার অভাব ঘটায়। অপর দিকে মূলানুসারী সমাসবদ্ধ পদগুলির নির্বিচারে ব্যবহার তাঁর গদ্যভাষাকে অতিমাত্রায় সংস্কৃতগন্ধী করে তুলেছে। 'মমত্বাকৃষ্টমানস', 'নিত্যমুক্তিকারণীভূতা', 'বিহিন্নজঙ্ঘা', 'চাপজ্যানি', 'ছিন্নধন্না','উদ্যছশাঙ্কছবি', 'সেনানুকারি','মদোদ্ধতমুখরাগ',ইত্যাদি অসংখ্য সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদকে অনুবাদক সরল বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। ফলে দেবীমাহাত্ম্যের ভাবমাধুর্যটি তাঁর অনুবাদে অনেকাংশেই থেকে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন। যেমন:

" দুর্গায়ৈ দুর্গপরায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যে।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥"

অনুবাদক লিখেছেন:

" দুর্গা দুর্গপরা ও সারা ও সর্ব্বকারিনী ও খ্যাতি ও কৃষ্ণা ও ধূম্রা, ও অতিসৌম্যা ও অতিরৌদ্রা ও জগৎপ্রতিষ্ঠারূপা ও দেবী ও কৃতিরূপা যে তুমি তোমাকে নমস্কার" (পুঁথির পৃষ্ঠা ১৮)।

দশটি সংযোজক অব্যয় 'ও' -এর সূত্রে গাঁথা বারেটি মূলানুসারী তৎসম বিশেষণের এই মালিকায় সার্থক দ্যোতনার অভাবে মূলের গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও আবেগস্পন্দিত ভক্তিভাবটি ধরা পড়েনি। এরকম 'ও' অব্যয়ের সংযোগে বাক্যকে দীর্ঘ করা অনুবাদকের একটি বৈশিষ্ট্য। একই ভাবে 'তথা' শব্দের পুনঃপুন ব্যবহারেও অনুবাদক বাক্যকে দীর্ঘ করেছেন :-

"ক্ষীরোদ সমুদ্র নির্ম্মল হার তথা জরারোহিত বস্ত্রদ্বয়। তথা কর্ণের কুন্ডলদ্বয়

তথা বলয় তথা শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র তথা সকল হস্তে তড় তথা নির্ম্মল দুই নূপুর তথা বড় উত্তম কর্ণভূষা তথা সকল অঙ্গুলিতে অলঙ্কার দিলেন।'' (পু: পৃ: ৭- ৮)

'-ইয়া' প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহারে বাক্যকে দীর্ঘ করাও অনুবাদকের বাক্যগঠনের আর একটি বৈশিষ্ট্য :

''প্রবল শত্রুরা রাজার পুরে আসিয়া ঐ রাজাকে আক্রমণ করিয়া রাজার দুষ্ট বলবান দুরাত্মা আমাত্যেদ্দের সহিত মিলিত হইয়া রাজার ভান্ডার ও সৈন্য অপহরণ করিয়া লইল।''(পু: পৃ: ১-২)

রচনার বর্ণনাত্মক অংশগুলিতে শব্দ চয়ন ও পদসজ্জায় অনুবাদক অনেকটা স্বাধীন ও স্বাভাবিক হয়েছেন। পুঁথির প্রস্তাবনা, সুরথরাজা ও বৈশ্যের কথা, মধুকৈটভের বিনাশ, মহিষাসুরের যুদ্ধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ, ইত্যাদি অংশে শব্দচয়নে অনুবাদক স্তব ও বন্দনা অংশগুলির মত অতটা সংস্কৃতানুসারী নন। এই সব অংশে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি চলিত্ ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগে তাঁর গদ্যভাষাকে সহজ ও কিছুটা স্বচ্ছন্দগতি করে তুলতে পেরেছেন। এই ক্ষুদ্র পুঁথিটিতে এমন চলিত্ ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট। কয়েকটি উদাহরণ:

-''মধুকৈটভ সকল জলমগ্ন দেখিয়া ফাকি করিয়া কহিল ...''(পু: পৃ: ৫)।

-''বিষ্ণু জঘনদেশে তাহাকে থুইয়া ...''(পু: পৃ: ৬)।

-''সিংহ ...এক চাপড়েতে চামরের মস্তক্কে শরীর হইতে পৃথক করিল।''(পু: পৃ:১৩)

-''মহিষাসুর সেই ভগবতীর গনেদিক্কে... নিশ্বাস বায়ুর দ্বারা পৃথিবীতে পাড়িয়াছিল। (পু: পৃ: ১৩)

-''মহিষাসুর তোমাকে হটাত যে প্রহার করিয়াছিল সে আশ্চর্য।''(পু: পৃ: ১৬)

-''পুন্যবান জন প্রতিদিন অতি আদৃত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে ও স্বর্গে জায়। (পু: পৃ: ১৬)

-''ক্ষীরোদসমুদ্র মহনে যে উচ্চৈশ্রবা ঘোড়া উঠিয়াছিল তাহা...।'' (পু:পৃ:২০)

-''কাহারো পেট নখেতে চিরিল...।''(পু: পৃ: ২১)

-''যে রক্ত পড়িবেক তাহা সকল তুমি খাও।''(পু: পৃ: ২৪)

-''সেও দেবীকে গদার বাড়ি মারিল।''(পুঃ পৃঃ ২৪)

-''দেবীর বাহন সিংহকে এক কোপ মারিল।''(পুঃ পৃঃ ২৫)

-''দেবী সেই শূল আসিতেছে দেখিয়া এক কিল মারিয়া তাহা চূর্ণ করিলেন।'' (পুঃ পৃঃ ২৫)

-''শুম্ভ ক্রোধ করিয়া রথে চড়িয়া আট হস্তে [চলিত্+সাধু] অস্ত্র ধারণ করিয়া দেবীকে মারিতে চলিল।''(পুঃ পৃঃ ২৫)

-'' শিবদূতী খট্২ করিয়া হাসিয়াছিলেন।''(পুঃ পৃঃ ২৬)- ইত্যাদি।

সর্বদেশে এবং সর্বকালেই সাধু বা লিখিত ভাষার ওপর কথ্য বা চলিত ভাষার একটা প্রভাব থাকে, চলিত ও আঞ্চলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে রচয়িতাগণের ভাষায়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাধুভাষার ওপর চলিত্ ও আঞ্চলিক ভাষার এরকম প্রভাব দেখা যায়। মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে সে নিদর্শনের অভাব নেই। উনিশ শতকে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দের রচনাতেও সাধু ও চলিত্ শব্দের এমন মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। দেখা যাচ্ছে যে সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদকও গল্প রসের পরিবেশনে এবং কথোপকথন কালে পাত্র-পাত্রীর ভাষণে তৎসম শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে চলিত্ ও আঞ্চলিক শব্দের মিশ্রন ঘটিয়েছেন। এটা ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবে, সম্ভবতঃ অনুবাদকের অজ্ঞাতসারেই। অর্থাৎ সচেতন ভাবে এ মিশ্রন অনুবাদক ঘটাননি, ভাবানুযায়ী ভাষাই নিসৃত হয়েছে তাঁর লেখনিমুখে এবং সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যের।

উনিশ শতকের সূচনাপর্বের সাধুগদ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যও[১৭] সুরথমেধসীয় সম্বাদে বিদ্যমান। অনুবাদক ষষ্ঠী বিভক্তান্ত পদের সঙ্গে বহুবচনের 'দিগ্' বিভক্তির যোগে 'শাবকেরদিগের', 'মনুষ্যেরদিগের', ইত্যাদি লিখেছেন। যেমন, ''তিনি প্রসন্না হইয়া বরদা হইলেই মুষ্যেরদিগের মুক্তি হয়''(পুঃ পৃঃ ৪)। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুবাদকের বিশেষত্ব এই যে একই পৃষ্ঠার মধ্যেই তিনি আবার 'তাহাদের', 'তাহাদিগের', 'দেবতাদিগের', প্রভৃতি সাধারন রূপও ব্যবহার করেন। যেমন, ''আমার মন যে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা পায়না ...''(পুঃ পৃঃ ৩)। আবার এই রকম পদে দিগ্ + দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' যোগে মহাসুরেরদিগ্কে > 'মহাসুরেরদিক্কে' (পু : পৃঃ ১১), এমন রূপও পাওয়া যাচ্ছে। সেই রকম দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' যোগে 'তাহাদিক্কে' (পুঃ পৃঃ ১), 'কাহাদিক্কে'(পুঃ পৃঃ ১৩),

'গণেদিক্কে' (পু: পৃ: ১৩), এমনকি বিচিত্র বানানে 'দিগ্কে' (পু: পৃ: ২৩) ও লক্ষ্য করা যায়। চলিত ভাষার দিকে এরকম একটা ঝোঁক অনুবাদকের রচনায় প্রায় সর্বদাই বিদ্যমান। ক্রিয়া পদের কয়েকটি বিশিষ্ট রূপ প্রয়োগের প্রতি অনুবাদকের কিছু আসক্তি আছে যেমন, 'আইস' 'আইলেন', 'আইল'- ''রক্তবীজ মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল'' (পু: পৃ: ২৪)। অনুরূপ ভাবে ক্রিয়াবাচক পদ 'করিবা' 'যাইবা', 'পাইবা', 'হইবা' প্রভৃতির প্রয়োগও অনুবাদকের রচনায় দেখা যায়। দেবী ও অসুরদূতের কথোপকথোন এবং রাজা ও বৈশ্যকে দেবীর বরদান কালে পাত্র পাত্রীর বিবৃতিতে এরকম পদের প্রয়োগ বেশী হয়েছে-''তুমি একা স্ত্রী কি করিবা... তাহা যদি না করহ তবে কেশাকর্ষনেতে নির্গত গৌরবা হইয়া যাইবা'' (পু: পৃ: ২০); ''অল্পদিনের মধ্যে নিজ রাজ্য পাইবা ও তোমার শত্রু নষ্ট করিয়া তুমি রাজা হইবা''(পু: পৃ: ৩৩), ইত্যাদি। যেখানেই গদ্যভাষা সংলাপধর্মী, সেখানেই এরকম কথ্য রীতির দিকে অনুবাদকের ঝোঁক্ রয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যে এবং সমসাময়িক কালে রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায়ও এমন নিদর্শন দেখা যায়। অনুবাদক মাঝে মাঝে 'ইয়া' এবং '–ই তে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার বদলে 'শতৃ' প্রত্যয়জাত '–অত' প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ করেছেন যেমন, 'করত', 'হওত' – ''অতি দুঃখেতে সঞ্চিত যে আমার ভান্ডার তাহা অসাম্যক ব্যয়যুক্ত ভৃত্যেরদের কর্তৃক ব্যয়িত হওত ক্ষয় হইয়াছে'' (পু: পৃ: ২), ইত্যাদি। তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক অর্থে 'করণক' শব্দের ব্যবহার ও সুরথমেধসীয় সম্বাদ-এ লক্ষ্য করা যায়- 'অতি দারুণ প্রহার করণক যুদ্ধ করিয়া ছিল ' (পু: পৃ: ২৩)। করা উচিৎ বা কারো, বলা উচিৎ বা বলো - এ রকম অর্থ বোঝাতে মৃত্যুঞ্জয় যেমন 'করিতে যোগ্য হও', 'কহিতে যোগ্য হও' ইত্যাদি মাঝে মাঝে লেখেন, দেখাযাচ্ছে যে সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদকও তেমনি- 'তাং ভবান দ্রষ্টুমর্হতি' এই অংশটির অনুবাদে লিখেছেন- 'তুমি তাহাকে দেখিতে যোগ্য হও', (পু: পৃ: ১৯)। রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত মাঝে মাঝে চতুর্থীর পরিবর্তে'' কে বিভক্তির প্রয়োগ এই অনুবাদকেরও বৈশিষ্ট্য। রামরাম যেমন লেখেন-'বিপরীত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল', তেমনি সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদকও লিখেছেন-'' তোমার যুদ্ধেতে আমরা তুষ্ট তোমাকে হইয়াছি...যদি আমাকে অদ্য তুষ্ট হইয়া থাকহ তবে আমার বধ্যহও,'' (পু: পৃ: ৬)। অনুবাদক বহুত্ববাচক পদেও বহুবচন বিভক্তির প্রয়োগ করেছেন, -''মাতৃগণেরা মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল'', (পু: পৃ: ২৫)।

নিতসম্বন্ধী বা পরস্পর সম্বন্ধী পদযুগলের ব্যবহারে অনুবাদক রীতি ভঙ্গ করে

কিছু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। স্বাভাবিক নিত্যসম্বন্ধী যেমন, 'যে-সে', 'যিনি-তিনি', ''যাহা-তাহা প্রভৃতি সর্বনাম, 'যতো-ততো', 'যেমন-তেমন', ইত্যাদি সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ, এবং 'যদি-তবে', 'বটে-কিন্তু' প্রভৃতি বাংলা নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় পদের নির্দশন তাঁর রচনায় যথেষ্ট। তবে 'যে- সে' এবং অনুরূপ নিত্যসম্বন্ধী পদের প্রয়োগই সবাধিক। কিন্তু অনুবাদকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অনেক সময় রীতি ভঙ্গকরে 'যে-সে' 'যতো-ততো', ''যেমন-তেমন, যাহা-তাহা ইত্যাদি স্বাভাবিক পদযুগলের প্রথমটির অথবা দ্বিতীয়টির কিছুটা পরিবর্তন করেছেন, যেমন:

'' যে প্রকারে সেই-সাবর্ণ অষ্টম মন্বন্তরাধিপ হইয়াছিল তাহা আমা হইতে শ্রবণ কর'' (পু: পৃ: ১)।

''জগতের গতি যে হরি তাহার যে মহামায়া তিনি জগৎকে মোহিত করিয়াছেন'' (পু: পৃ: ৪)।

এবং আর যে তোমার ভয়ানক রূপ আছে তদ্বারা আমাদিক্কে রক্ষা কর '' (পু : পৃ:১৭)

''এই যে অষ্টাদশ বিদ্যা এ তোমারি রূপ'' (পু : পৃ: ২৮)।

''যুদ্ধতে আমার যে দুষ্ট দৈত্যানির্বহন চরিত্র তাহা শ্রবণ করিলে ....'' (পু : পৃ: ৩১)

'' যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী পৃথিবীতে ছিল তাহা তুমি আহরণ করিয়া আনিয়াছ '' (পু:পৃ: ১৯)।

''ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী আছে সে সকল তোমার গৃহে আছে '' (পু : পৃ: ২০)।

''যেমন দুই মেঘ জলবৃষ্টি করে এমত বান বর্ষণ দুইজনে করিয়াছিল'' (পু : পৃ: ২৫)।

''দেবতার যেমত বাহন ও যেমত ভূষণ তদ্বিশিষ্ট হইয়া...''(পু : পৃ: ২৩)।

''পরে যাহা সুনিয়া মত্ত হস্তি সকল ভয় পাইয়াছিল এমত এক মহাশব্দ সিংহ করিয়াছিল'' (পু: পৃ: ২৫)।

এছাড়া 'যাবৎ-তাবৎ', 'যেমন-তেমন' ইত্যাদি পদযুগলের বিপরীত রূপও অনুবাদকের রচনায় দেখা যায় :

''সিংহ হইয়া তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ছিল যাবৎ সিংহের মস্তক দেবী ছেদন না করিয়াছিলেন'' (পুঃ পৃঃ ১৪)

''তেমত বর্ষণ করিয়াছিল যেমন সুমেরু পর্ব্বতে মেঘেতে যে বর্ষণ করে'' (পুঃ পৃঃ ১২)।

পরস্পর সম্বন্ধী পদযুগলের দ্বিতীয়টি -উহ্য, এরকম নিদর্শনও সুরথমেধসীয় সম্বাদে লক্ষ্য করা যায় :

১। ''পরে সেই পন্ডিত যে বৈশ্য (সে -উহ্য) অবিবিক্ত চিত্ত হইয়া জ্ঞান যাচিঞ্চা করিল। যে আমার এই ও আমি এই এরূপ যে মায়াসঙ্গ (সে-উহ্য) না থাকে'' (পুঃ পৃঃ ৩৩)।

২। ''আমার মহাত্ম্য যদি শ্রবণ করে (তবে-উহ্য) তাহার উপসর্গ নষ্ট হয়'' (পুঃ পৃঃ ৩১)।

অনুবাদক কাহিনী বর্ণনায় প্রধানতঃ সরল বা নিত্য অতীত কালের ক্রিয়া রূপ (কহিল, কহিলেন) ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই ধারা ছেদ করে দু এক স্থানে পুরাঘটিত বর্তমান (কহিয়াছে, কহিয়াছেন) অথবা পুরাঘটিত অতীত (কহিয়াছিল, কহিয়াছিলেন) কালের ব্যবহারও দেখা যায়। তবে কাহিনীর সুরুতে এবং মাঝে মাঝেই যখনি কথকের বিবরণ রূপে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ', 'বৈশ্য উবাচ' বা 'রাজোবাচ' ইত্যাদি এসেছে, অনুবাদক তখনি ঘটমান বর্তমান(রাজা কহিতেছেন) অথবা পুরাঘটিত বর্তমান(মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন) কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করেছেন।

সুরথমেধসীয় সম্বাদে অনুবাদক নানা দৈর্ঘ্যের মিশ্র বা জটিল বাক্য ব্যবহার করেছেন। এদের কোনটি ছোট, কোনটি মধ্যম দৈর্ঘ্যের আবার কোনটি দীর্ঘ। বিশেষতঃ 'ও' 'এবং' 'আর' ইত্যাদির সংযোগে গঠিত যৌগিক বাক্যগুলি বেশ দীর্ঘ। ফলে কোন কোন বাক্যে পদের ক্রম ও পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতির অভাব ঘটেছে। তবে বাক্যাংশের স্থান পরিবর্তনগত অসঙ্গতিই বেশী। তবু প্রায় সমগ্র রচনাটিতে নানা দৈর্ঘ্যের বাক্য ব্যবহৃত হওয়ায় একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। একটি দৃষ্টান্ত :

'' হে দেবি দৈত্যের পতি যে শুম্ভ তিনি ত্রৈলোক্যর ঈশ্বর। তিনি তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। যে শুম্ভের আজ্ঞা দেবতারা লঙ্ঘন করিতে পারেনা আর যিনি সকল দেবতাদিগকে জয় করিয়াছেন তিনি যে কথা কহিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। আমার সকল ত্রৈলোক্য ও আমার বশীভূত হইয়া সকল দেবতারা পাশ্চাৎ ২ গমন

করে। আমি সকল দেবতার যজ্ঞভাগ ভোজন করি আর ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী আছে সে সকল আমার গৃহে আছে।''(পুঃ পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত অশংটিতে মোট পাঁচটি বাক্য আছে। প্রথম বাক্যটিতে পদসংখ্যা ৯, দ্বিতীয়টিতে ৫, তৃতীয়টিতে ২১, চতুর্থটিতে ১৩ এবং পঞ্চমটিতে ১৮। কাহিনী বর্ণনায় যে নানা দৈর্ঘ্যের বাক্য প্রয়োগ প্রয়োজন, মনেহয় অনুবাদক সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। আরো লক্ষণীয় যে অনুবাদকের ভাষা এখানে স্বচ্ছন্দগতি। সংস্কৃতের কৃত্রিম আবরণ মুক্ত হয়ে তাঁর ভাষায় এখানে যেন ফুটে উঠেছে একটা স্বাভাবিক গল্প বলার ছন্দ।

'ও', 'এবং', 'আর' ইত্যাদি সংযোজক সহযোগে বাক্যকে দীর্ঘকরা ছাড়াও অনুবাদকের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পূর্ণচ্ছেদের পরেও এই সব সংযোজক পদগুলি দিয়ে নতুন বাক্য সুরু করা। যেমন, ''... এমত যে তুমি তোমার নিকটে নত হইলাম। আমাদিক্কে মঙ্গল দেও। এবং ভগমান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ও হর ...'', ইত্যাদি। কোন কোন সমালোচক পূর্ণচ্ছেদের পর এরকম 'ও', 'এবং', 'আর' প্রভৃতি দিয়ে বাক্যের সূচনা কে বাংলা গদ্যের উপর ইংরাজী রচনারীতির প্রভাব বলে চিহ্নিত করেছেন। যে সব বাক্যাংশকে সহজেই এক কথায় অথবা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারতো, অনুবাদক সেগুলিকে বিস্তৃত রূপেই লেখেন। যেমন, ''যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা'' - এখানে, ''অবিচিন্ত্য মহাব্রতা''-এর অনুবাদে অনুবাদক 'দুরনুষ্ঠেয়' লেখেননি, লিখেছেন ''দু:খেতে অনুষ্ঠান করি যে মহাব্রত''। অনুরূপ ভাবে ''মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্ত সমস্ত দৌষে'' (অস্ত-সমস্ত-দৌষে)।এর অনুবাদ হয়েছে ''মোক্ষার্থি ও নষ্ট সমস্ত দোষ এমত মুনি সকলও''(পুঃ পৃঃ ১৫) - সর্বদোষ বর্জিত বা সকল দোষহীন নয়। যথাযথ ভাবে মূলানুসরণের প্রেরণাতেই ''সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথা: পরমাপদ:''-এর অনুবাদ হয়েছে ''তুমি আমারদিগের কর্তৃক সংস্মৃতা সংস্মৃতা হইয়া আমারদিগের আপদ নষ্ট করিবা'' (পুঃ পৃঃ ১৭)। যে হেতু মূলে ''সংস্মৃতা'' শব্দটি দু'বার আছে, তাই বাংলায় 'যখনি তোমাকে স্মরণ করিব'-এরকম না লিখে অনুবাদক শব্দটি দুবারই ব্যবহার করেছেন। মাঝে মাঝে কর্তাহীন বাক্য রচনা করা অনুবাদকের আর এক বৈশিষ্ট্য- ''পুনর্ব্বার দুষ্ট দৈত্যেরদিগের বধের নিমিত্তে ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধের নিমিত্তে ও লোকের রক্ষার নিমিত্তে ও দেবতারদিগের উপকারের নিমিত্তে দেহ ধারণ করিয়া গৌরী নামে সমুদ্ভুতা হইয়াছিলেন'' (পুঃ পৃঃ ১৭)। রচনার সংলাপধর্মী অংশগুলিতে অনুবাদকের ভাষা প্রায়ই বেশ সহজ সরল ও অনেকটা ভাবানুযায়ী ঃ

"শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবতীকে কহিল।। ওরে দুর্গে তুই আপনি বলবতী ইহা মনে ভাবিয়া অহঙ্কার করিও না। কেননা ব্রাহ্মনী প্রভৃতির বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিয়া আপনি অহংঙ্কার করিতেছ ।।০।। দেবী কহিতেছেন অরে দুষ্ট জগতের মধ্যে একা আমি আমাভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে। এ সকল আমারি সম্পত্তি অতএব দেখ। এ সকল আমাতেই লীন হয়।।" (পুঃ পৃঃ ২৫)

সুন্দর ও সুবোধ্য রূপে ভাবপ্রকাশের জন্য গদ্য ভাষায় নানা প্রকার ছেদ বা বিরামচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা যে কতটা, তা আজ আমরা জানি। বাংলা গদ্যে এই আধুনিক বিরামচিহ্নের ব্যবহার ইংরেজী ভাষার প্রভাবজাত। কিন্তু "সুরথমেধসীয় সম্বাদ" যে কালের রচনা, সে সময়ে বাংলা গদ্যে ছেদ চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার প্রচলিত হয়নি। সংস্কৃতে এবং মধ্যযুগীয় কাব্য সাহিত্যে যেমন এক দাঁড়ি (।) এবং দুই দাঁড়ি (।।) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, বাংলা গদ্যে তখনো তাই চলছে। শ্বাস-প্রশ্বাস ও একটা ছন্দানুসারী, ব্যাকরণ অনুমোদিত ইংরেজী গদ্যের বিরামচিহ্ন গুলি ছিল অনেক উন্নত মানের। বাংলা গদ্যে তাদের আগমন তখনো ঘটেনি। আইনের অনুবাদগুলিতে, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসনেও এক দাঁড়ি এবং দুই দাঁড়ি ব্যতীত আর কোন বিরাম চিহ্ন দেখা যায় না। উইলিয়াম কেরীর সমকালীন রচনা গুলিতেও সেই একই অবস্থা। শুধু ১৮০১-৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের কোন কোন প্রশ্নোত্তর মূলক প্রচার পুস্তিকায় (tract) জিজ্ঞাসা চিহ্নের (?) ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তার ব্যবহারও ছিল বিচিত্র: "যে পরমেশ্বর তোমার প্রতি এমত দয়াবান তাহার প্রতি তোমার কি কর্তব্য ?। "(কর্ম্মনির্ণয়-১৮০৭)। লেখক প্রশ্নবোধক বক্তব্যের শেষে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, আবার সমকালীন বাংলা গদ্যের প্রচলিত রীতি মেনে একটি দাঁড়িও বসিয়েছেন। সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের আদর্শ অন্বেষণের যুগে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে এরকম একটা দ্বিধার পরিচয় প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্টতঃই বিষয়টি সেকালের গদ্যলেখকদের কাছে একটা সমস্যা ছিল।

সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদক তাঁর রচনাকে অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেননি, আগাগোড়া একটানা লিখে গেছেন। অধ্যায়গুলি সংখ্যা চিহ্নিতও নয়। তবে অনুবাদক প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছেন ।।০।।০।। -এই রকম বিরাম চিহ্নের দ্বারা। যেমন, "এই পর্য্যন্ত রক্ত বীজের বধ ।।০।।০।।"(পুঃ পৃঃ ২৫)। অনুচ্ছেদ শেষে

সাধারণত: ॥০॥ এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। কমা (,) ও সেমিকোলন(;) বোঝাতে এক দাঁড়ি (।) এবং পূর্ণচ্ছেদের ক্ষেত্রে দুই দাঁড়িই (॥) সাধারণত: ব্যবহৃত হয়েছে, তবে সর্বদা এ নিয়মও মানা হয়নি। অবশ্য এ বিষয়ে অনুবাদক তাঁর কালের প্রচলিত রীতিই অনুসরন করেছেন, তাঁর কাছে ত্রুটিহীন বিরামচিহ্নের ব্যবহার আশা করা যায় না।

॥ ৮ ॥

''সুরথমেধসীয় সম্বাদ'' গদ্য পুঁথিটিতে রচনা কালের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি যে সুরথমেধসীয় সম্বাদ ''বেদান্তসার'' এবং পুরাণের ''স্থূল তর্জমার'' পুঁথিগুলি রেঃ ওয়ার্ডের গ্রন্থের প্রয়োজনেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। রেঃ ওয়ার্ডের উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৮১২ সাল। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় রেঃ ওয়ার্ড জানিয়েছেনযে ১৮০১ সাল থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ ও তাঁর গ্রন্থ রচনার কাজ সুরু করে দিয়েছিলেন। সুরথমেধসীয় সম্বাদের সঙ্গে প্রাপ্ত বেদান্তসার অনুবাদ পুঁথিটির রচনাকাল ১৮০৩, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে তার অনতিকাল পূর্বে কোন সময় থেকে রেঃ ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় বঙ্গানুবাদগুলি সংগ্রহ করে থাকবেন। এই গদ্যপুঁথিগুলির হস্তাক্ষর বিভিন্ন, সম্ভবত: বাংলা অনুবাদগুলি সত্বর পাওয়ার জন্য অনুবাদ কর্মে বিভিন্ন ব্যাক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাই মনে হয়, ১৮০২ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যেই কোন সময়ে সুরথমেধসীয় সম্বাদ ও পুরানের স্থূল তর্জমাগুলি রচিত হয়েছিল।

'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিটির বিভিন্ন অক্ষরের গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর ল, ন, ধ, ছ, ঔ, ভূ, ভৃ, ত্য প্রভৃতি অক্ষরগুলির গঠন নিশ্চিতরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তকালকে চিহ্নিত করে। তু, ত্ত এবং ও, ল এবং ন, ত এবং ৎ -এর ছাঁদ প্রায় একইরকম। র-এর ফুট্‌কি আছে, কিন্তু রু, রূ-এর ফুটকি নেই। আবার অ, আ প্রভৃতি কিছু অক্ষরের গঠন কখনো পুরাতন ছাঁদের কখনো নূতন ছাঁদের। লেখক পুরাতন ছাঁদেই লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু নূতন কালের প্রভাবকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। মুদ্রণশিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে ছাপার অক্ষরের গঠন তাঁকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। উনিশ শতকের প্রত্যুষে রচিত 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিটির অক্ষরের গঠনে ধ্বনিত হচ্ছে সেই কালান্তরের বার্তা। 'বেদান্তসার' পুঁথিটির অক্ষরের গঠনেও এই একই বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সুদূর অতীত কাল থেকে লিপিগত বিচ্যুতির সংশোধনের জন্য লিপিকারগণ

নানা পন্থা অবলম্বন করে আসছেন। পুঁথিরচনা কালে লেখক বা লিপিকারের নানা ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটতে পারে। পুঁথির ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন ও পরিমার্জনার জন্য রঙ, এবং সংশোধনের স্থান বিশেষকে চিহ্নিত করার জন্য নানা প্রকার চিহ্নের ব্যবহার যে দীর্ঘ কালাবধি প্রচলিত আছে, একথা পুঁথির পাঠক মাত্রেই জানেন। লেখক কর্তৃক বহু সংশোধন ও সংস্কারের পরও 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' পুঁথিটিতে নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে। পরিবর্জনের ক্ষেত্রে লেখক যে হলুদ রঙ্ ব্যবহার করেছেন, সে কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সংশোধন ও সংযোজনের জন্য এক্ষেত্রে স্থানবিশেষে কখনো ^ এই রকম, কখনো ৮ এই চিহ্ন দিয়ে সংযোজিত অংশটি পুঁথির মার্জিনে লেখা হয়েছে। এখন পুঁথিটিতে প্রাপ্ত নানাপ্রকার বিচ্যুতির কিছু পরিচয় দেওয়া যাক্।

অক্ষর ও বানানগত বিচ্যুতি : পুঁথিটিতে চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) ব্যবহার অনিয়মিত। অনেক সময় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয়নি। যেমন ''ফাকি'' (= ফাঁকি, পু : পৃ : ৬), ''কাপাইয়া'' (= কাঁপাইয়া, পু : পৃ : ১১), ইত্যাদি। হউক শব্দটি 'হওক' (পু: পৃ: ৯) এবং হ্রাস শব্দটি 'হ্রাস' (পু : পৃ : ২৫) এই রকম বানানে লেখা হয়েছে। অনবধান বশত: বানানগত বিচ্যুতির সংখ্যা অনেক, এ ধরনের বিচ্যুতির প্রকৃতি বোঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ : ''কর্ণের মলেতে'' হয়েছে 'কর্ণের মলাতে' (পু . পৃ: ৪). 'মোহ করহ' হয়েছে 'মেহ করহ' (পু. পৃ : ৬), 'মাথার' হয়েছে 'মাতার' (পু. পৃ ১১). 'পাতন করিলেন' হয়েছে 'পতন করিলেন' (পু. পৃ: ১১), 'সমুদয়' হয়েছে 'সমদয়' (পু. পৃ: ১৫), 'করিতেছ' হয়েছে 'করিতেছে' (পু. পৃ: ১৯), 'সম্মুখে' হয়েছে 'সম্মখে' (পু. পৃ: ২০), 'আচ্ছাদিত' হয়েছে 'আছাদিত' (পু. পৃ: ২৬), ইত্যাদি। 'অত্যন্তাহত' শব্দটি প্রথমে লেখা হয়েছিল 'অত্যান্তহত' এই বানানে, পরে হলদে রঙে আ-কার (া) মুছে দেওয়া হয়েছে (পু. পৃ: ১১)। একই বাক্যের মধ্যে ''ও'' সংযোজকের ঘন ঘন ব্যবহার শুধুযে বোধগম্যতা ও মাধুর্যের অভাব ঘটিয়েছে তাই নয়, মাঝে মাঝে একরম সংযোজকের অযথা ব্যবহার দেখা যায় - ''অন্য ২ দেবতা কর্তৃকো ও ভূষণদ্বারা অস্ত্র দ্বারা দেবী সম্মানিতা হইয়া...'' (পু. পৃ : ৯)। কোথাও কোথাও 'ও' এবং 'তথা' এই উভয় সংযোজকই একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে - ''নষ্ট করিলেন ও তথা অন্য অনেক মহাসুরেরদিক্কে...'' (পু. পৃ : ১১)। ''শ এবং 'স', 'ন' এবং 'ণ' 'য' এবং 'জ' এর ব্যবহারে লেখক স্বেচ্ছাচারী। 'দিক' শব্দটি তাঁর রচনায় সর্বদা 'দিগ্' রূপে পাওয়া যায়।

ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদজনিত বিচ্যুতি : মূল শ্লোকের অর্থ ঠিক ধরতে না পারায় সুরথমেধসীয় সম্বাদের বেশ কয়েকটি স্থানে অনুবাদকের অনুবাদ যথাযথ নয়। সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবই কি এর কারণ ? মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধের প্রাক্কালে মহিষের সেনাপতিগণের পরিচয় দিতে গিয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন :

"পঞ্চদশভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুর :।
অযুতানাং শতৈ : ষড়ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈ : পরিবারিত :।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যতে ॥"

অনুবাদক লিখেছেন : "পঞ্চাশৎ নিযুত রথেতে অন্বিত হইয়া আসিলোমা নামে অসুর যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং অযুতের ছয়শত রথেতে অন্বিত হইয়া আর অনেক সহস্র বৃদ্ধ (?) গজবাজিতে আবৃত হইয়া ও আর কোটি রথেতে আবৃত হইয়া বাস্কল নামে অসুর যুদ্ধ করিয়াছিল "(পু. পৃ : ১০)। স্পষ্টতঃই এখানে শ্লোকার্থ অনুবাদকের কাছে পরিস্কার হয়নি, ফলে পরিবারিত নামে মহাসুরের দায় বাস্কল নামে মহাসুরের কাঁধে আরোপিত হয়েছে। অনুবাদক লিখেছেন দেবী "শরেতে বিড়ালাক্ষের মস্তক শরীর হইতে পাত করিলেন" (পু. পৃ: ১৩)। কিন্তু মূলানুসারে "বিড়ালাস্যাসিনা কায়াৎ পাতায়ামাস বৈ শিরঃ।" অর্থাৎ দেবী অসিরদ্বারা বিড়ালাসুরের মস্তক দেহ থেকে নিপাতিত করলেন। এর পরের লাইনেই আছে, দেবী শরবর্ষণে দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামক মহাসুরদ্বয়কে যমালয়ে পাঠালেন। অনবধান বশত: অনুবাদক বিড়ালাক্ষকেও তাদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। ধূম্রলোচনের মৃত্যু হলে শুম্ভ নিশুম্ভের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে চন্ড মুন্ড যখন ঈষৎহাস্যময়ী সিংহবাহিনী দেবীকে অতি উৎসাহে ধরতে গেলো, তখন দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন তখন "কোপেন চাস্য বদনং সমীবর্ণমভূৎতদা"। অনুবাদক বলেছেন "ক্রোধেতে তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল" (পু. পৃ: ২২)। বহু সৈন্যসহ চন্ড মুন্ড নিহিত হয়েছে, এই সংবাদ শুনে :

" ততঃ কোপপরাধীনচেতা: শুম্ভ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥"

এখানে, "কোপপরাধীনচেতা :" পদটির অনুবাদ হয়েছে" ক্রোধেতে অবশীভূতচিত্ত হইয়া" (পু. পৃ: ২২)। দৈত্যরাজ শুম্ভ আরো আদেশ দিলেন :

"কোটিবীর্যানি পঞ্চাশদ্‌সুরানাং কুলানি বৈ।
শতকুলানি ধৌম্রানাং নিগচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥"

অর্থাৎ, কোটিবীর্য নামে অসুরদের পঞ্চাশটি কুল এবং ধৌম্রাসুরদের একশোটি

কুল আমার আজ্ঞায় যুদ্ধে যাক্। কিন্তু অনুবাদক লিখেছেন : ''অসুরের পঞ্চাশ কোটী বীরেতে সমুদ্ভব যে কুল। অর ধূম্র কুলোদ্ভব যে শত কুল তাহারা আমার আজ্ঞায় গমন করুক'' (পু. পৃ: ২২-২৩)। সমগ্র পুঁথিটিতে অর্থগ্রহণে এরকম অল্পবিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতি আরো কিছু ছড়িয়ে রয়েছে।

মূলের বর্জিত অংশ : সুরথমেধসীয় সম্বাদে দেবীমাহাত্ম্যের দুইটি শ্লোক এবং একটি শ্লোকের অর্ধাংশ অনূদিত হয়নি। অপরাজিতা স্তবের-

'' যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তি রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।''-

শ্লোকটি অনুবাদক বাদ দিয়েছেন। তাছাড়া ওই স্তবের অনুবাদে শ্লোকগুলির ক্রমও মার্কন্ডেয় পুরাণ বা শ্রী শ্রী চন্ডী অনুসারে যথাযথ নয়। নারায়ণী স্তুতির অর্ন্তগত-

'' সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমহস্তুতে ।।-

শ্লোকটিও সুরথমেধসীয় সম্বাদে অনূদিত হয়নি।

মূলের অতিরিক্ত অংশ : সুরথমেধসীয় সম্বাদে অনুবাদক কোন কোন অংশের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন। মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রাক্কালে 'অন্যগ্রন্থ' থেকে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে তিনি মহিষাসুরের সৈন্য ও সেনাপতির প্রকৃত সংখ্যানির্ণয়ের পদ্ধতি জানিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায় :

'' এক্ষনে মহিষাসুরের সেনার ও সেনাপতির ও রথের সংখ্যা শ্রবণ করহ।
একং দশশতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটীর্ব্বুদ মেবচ ।।
বৃন্দং খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খ পদ্মৌ চ সাগর।
অন্নং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃন্দ্যা যথোত্তরং ।।

এই সকল উত্তর উত্তর দশগুণ সংখ্যা জানিয়া সৈন্যনিরূপন করিয়া সংখ্যা জানাইবার কারণ অন্যগ্রন্থ হইতে লিখিলাম '' (পু:পৃ: ১০)

অনুরূপভাবে নারায়ণী স্তুতিতে দেবগণ যেখানে দেবীকে বলেছেন ''বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবী ভেদা: স্ত্রিয়: সমস্তাঃ সকলা জগৎসু''- সেখানে ''বিদ্যা সমস্তাস্তব'' অংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনুবাদক শাস্ত্রোক্ত অষ্টাদশ বিদ্যার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন:

'' হে দেবী (১) শিক্ষা (২) কলপ (৩) ব্যাকরণ (৪) নিরুক্ত ও(৫) জ্যোতিষ ও (৬) ছন্দস্ ও (৭) সামবেদ (৮) ঋক্‌বেদ (৯) যজুর্বেদ ও (১০) অথর্ব্ববেদ ও

(১১) ধর্ম্মশাস্ত্র ও (১২) পুরাণ ও (১৩) মিমাংসা ও (১৪) ন্যায়শাস্ত্র ও (১৫) আয়ুর্ব্বেদ ও (১৬) ধনুর্ব্বেদ ও (১৭) গন্ধর্বশাস্ত্র এই যে অষ্টাদশ বিদ্যা এ তোমরি রূপ ''(পুঃপৃঃ ২৮)।

লক্ষণীয় যে ১৭টি বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, বাদ পড়েছে অর্থশাস্ত্র। তাছাড়া উক্ত স্তুতিতে দেবগণ যেখানে বলছেন :

কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমহস্তুতে ॥''

সেখানে অনুবাদক '' কলাকাষ্ঠাদি'' অংশটিরও একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন :

''অষ্টাদশ নিমেষেতে হয় এক কাষ্ঠা সেই কাষ্ঠার ত্রিশেতে হয় এক কলা কলার ত্রিশেতে হয় ক্ষণ ক্ষণের দ্বাদশেতে হয় মূহুর্ত্ত মূহুর্ত্তের পঞ্চদশেতে হয় দিন এই সকল রূপেতে জগতের পরিপাক করিতেছ যে তুমি হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার'' (পুঃপৃঃ ২৮)।

কিন্তু শ্লোকটির দ্বিতীয় লাইন অনুবাদে বাদ পড়েছে।

বর্তমানে শ্রী শ্রী চন্ডীর প্রায় ত্রিশটি টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে ব্রাহ্মণ-পন্ডিত সমাজে এদের মধ্যে প্রধান প্রধান টীকা গুলি অবশ্যই সুপরিচিত ও সমাদৃত ছিল এবং শ্রী শ্রী চন্ডীর মূল পুঁথির সঙ্গে এই সব টীকার পুঁথিও সংগৃহীত হোত। আলোচ্য পুঁথিটিতে অনুবাদের প্রকৃতি দেখে মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত নাগোজী ভট্টের টীকা, ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী টীকা বা অনুরূপ কোন কোন টীকার সঙ্গে অনুবাদকের পরিচয় ছিল। তাছাড়া সমকালীন শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠক ব্রাহ্মণ পন্ডিত সমাজে নাগোজী ভট্টের ''কাত্যায়নীতন্ত্র'' ও ছিল একটি সুপরিচিত গ্রন্থ। কিন্তু সে যাইহোক, দেখা যাচ্ছে যে অনুবাদকর্মে অনুবাদক যথেষ্ট যত্নবান ও সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

॥ ৯ ॥

সুরথমেধসীয় সম্বাদ গদ্য পুঁথির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যে সব ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা গেল, তার অধিকাংশই হয়তো অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের গদ্য রচনাগুলিতে পাওয়া যাবে। এই কালের রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এদের বাক্যের গঠন অনেকটা স্বাভাবিক হলেও আধুনিক সমালোচকগণ যাকে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ধর্ম বলেছেন, সেই আদর্শটি তখনো এই সব রচনায় রূপায়িত হয়নি। এই কালের রচনাগুলিতে বাংলা গদ্যের সেই স্বাভাবিক ধর্মের অন্বেষণ চলছে নিরন্তর। বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা গদ্য রচিত হয়ে আসছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি বিচার

করে দেখলে দেখা যাবে যে, সে ছিল মূলত: কাজের ভাষা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় কবিগণ কাব্য লিখতেই কলম ধরতেন। কিন্তু কালান্তরে নূতনতর পরিবেশে সাহিত্যের প্রয়োজনে, অনুবাদ কর্মে, তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় বা সংবাদ পরিবেশনে যখন সে ভাষার ব্যাপক প্রয়োজন হল, তখন রচয়িতাগণ সেই অপরিশোধিত গদ্যভাষার দৈন্য তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করেছিলেন। ''যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার'' প্রয়োজনে একদিন খুলে গেলো সেই সিংহদ্বার, যার বাইরে সুদূর প্রসারিত নূতন জগৎ, নূতন রূপ রস গন্ধ বর্ণের আহ্বান। তখনি সুরু হয়েছিল ব্যাপকভাবে বাংলা গদ্যের পরিশোধন ও সৌকর্যসাধনের সাধনা। তারই সঙ্গে এক আশীর্বাদ স্বরূপ ঘটল মুদ্রণ যন্ত্রের আবির্ভাব। অনেক লেখক লেখনী ধরলেন, বৃদ্ধি পেলো পাঠকের সংখ্যা। অতি দ্রুত গতিতে বাংলা গদ্য গড়ে উঠতে লাগল সর্ববিধ ভাবপ্রকাশের সার্থক বাহনরূপে। সে ছিল এক যৌথ ও ব্যপক উদ্যোগ, যার নেতা ছিলেন প্রধানত: রেভারেন্ড ড: উইলিয়াম কেরী। সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্যোগ হল ব্যাপকতর- কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

সুরথমেধসীয় সম্বাদের গদ্যভাষা লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে অনুবাদক যে কথাটি বলতে চাইছেন, যে ভাবে বলতে চাইছেন, সে কথা সে ভাবে ব্যক্ত করার ভাষা যেন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। বাক্য দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে পড়ছে, অন্বয়বন্ধন শিথিল হচ্ছে, এসে যাচ্ছে আভিধানিক শব্দ। ভাষার এই অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রীতির প্রতিফলন বা সার্থক সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস ফলবতী হতে পারে না। উনিশ শতকের উষালগ্নে সকল লেখকের রচনাতেই অল্প-বিস্তর এই ''প্রকাশের ব্যাথা'', এই ''কথা খুঁজে খুঁজে ফেরা''। এ সেই বাংলা গদ্যের যথার্থ প্রকৃতিরই অন্বেষণ। আলোচ্য রচনায় অনুবাদককে শব্দ চয়নের জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হয়নি, কারণ তাঁর অনুবাদের সাধু গদ্যে অধিকাংশই তৎসম শব্দ, আর সেগুলি এসেছে মূল শ্লোক থেকে। তাঁর বাক্যের গঠনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রম ঠিকই আছে, কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রকৃতি অনুসারে পদসজ্জা, জটিল ও দীর্ঘ বাক্যে সম্প্রসারক বাক্যাংশের যথাযথ সংস্থাপন, ক্রিয়া পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সংযোজক ও নিত্যসম্বন্ধীপদের সার্থক প্রয়োগের অভাব ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও গতিশীল স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হয়েছে। এই অস্বাচ্ছন্দ্যের একটি কারণ হয়তো এই যে সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদক রামরাম বসু বা পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সমশ্রেণীর প্রতিভাধর গদ্যলেখক ছিলেন না এবং এই ফরমাসী রচনাটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, একথা ভেবেই হয়তো তিনি এর ভাষার সৌকর্যসাধনে বিশেষ মনোযোগী হননি। কিন্তু তা হলেও তাঁর রচনা সৃজ্যমান বাংলা গদ্যসাহিত্যের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

অনুবাদকের সমকালীন এই বাংলা গদ্যভাষা কি ভাবে পরম্পরাক্রমে পরিশীলিত হয়েছে, বহু পাঠকের পঠনপাঠনে, পুস্তক পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় রূপান্তরিত হতে হতে কখন তাতে ফুটে উঠেছে নবযৌবনের লাবণ্য, বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত রচতিার পুঁথির পৃষ্ঠা থেকে রামরাম, মৃত্যুঞ্জয়, গোলোকনাথ, ফেলিক্স কেরী,জন ক্লার্ক মার্শম্যান, রামমোহন প্রমুখ গদ্য স্রষ্টাগণের সম্মিলিত সাধনায় সত্যদ্রষ্টা খ্রীষ্টীয় সাধক উইলিয়াম কেরীর ধ্যানের বঙ্গভাষা কিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় পরিণতি লাভ করেছে, বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু সুরথমেধসীয় সম্বাদের গদ্যভাষার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সে সময়ে যে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপক প্রয়াস চলেছিল তার কিছু পরিচয় উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৮০০ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ‘‘ মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত’’ নামে Gospel of st. Mathew এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ১৭৯৬ সালেই মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মূল গ্রীক থেকে অনূদিত ‘‘মঙ্গল-সমাচার’’ অনুবাদে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকাই প্রধান হলেও এতে জন্ টমাস এবং মি: ফাউন্টেনেরও কিছু অবদান ছিল। তাছাড়া উইলিয়াম কেরী গ্রন্থটির ভাষাকে মার্জিত করার জন্য রামরাম বসু ও মোহন প্রসাদ ঠাকুরের সহায়তাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দ সজ্জায়, অন্বয় বন্ধনে বাক্যের গঠনে ও বহুবিধ ব্যাকরণগত ত্রুটিতে গ্রন্থটির ভাষা জড়তাগ্রস্ত ও মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য :

‘‘ পর্ব্ব ৯ পরে তিনি জাহাজে প্রবেশ করিয়া পার হইয়া উত্তরিলেন আপনার সহরে। দেখ তাহারা আনিল একজন অঙ্গ অবস শর্য্যে শুইয়া। এবং য়েশু তাহারদের ভক্তি দেখিয়া বলিলেন সে অঙ্গ অবসকে বাছা স্থির হও তোমার পাপ মর্য্যাদা হইল। তখন দেখ অধ্যাপক মনে ২ বলিল এ মনুষ্য পাষন্ডতা করে। কিন্তু যেশু তাহারদের মনন জ্ঞাত হইয়া বলিলেন কেন অন্তরে দষ্ট মনন কর একারণ অনায়াসে কি বলিতে তোমার পাপ মর্য্যাদা হইয়াছে কিম্বা কহিতে উঠিয়া বেড়াও কিন্তু তোমারদের জানিবার জন্য মনুষ্যের পুত্রের পরাক্রম আছে পাপ মাফ্ করিতে পৃথিবীতে তখন তিনি বলিলেন সে অঙ্গ অবস মনুষ্যকে উত্থান কর তোমার শর্য্যা তুল বাটীতে যাও। তাহাতে সে উঠিয়া গেল তাহার বাটীতে কিন্তু মনুষ্য তাহা দেখিলে চমৎকৃৎ হইয়া স্তব করিল ঈশ্বরকে যিনি দিয়াছিলেন এমত পরাক্রম মনষ্যেরদিগকে। ~ ’’ (১-৮)[১৮]

বাইবেলের অক্ষরিক অনুবাদের এটি একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রচনাটি যে কালের, তখন বাংলা ভাষায় কেরীর জ্ঞান ছিল সীমিত, কিন্তু পন্ডিতদের দ্বারা সংস্কারের পরেও এতে যে জড়তা ও দুর্বোধ্যতা থেকে গেছে তার কারণ বাইবেলের বাণীকে মন্ত্রবৎ জ্ঞানে অনুবাদকগণ আক্ষরিক ভাষান্তরের পথে গেছেন। তাছাড়া গ্রন্থটিতে বাক্যের গঠনও ইংরাজীর মত। বাইবেল অনুবাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে অনুবাদকগণ গ্রীক্, হিব্রু ও ইংরাজী বাইবেল মিলিয়ে প্রতিটি শব্দের সঠিক্ বাংলা প্রতিশব্দ বাঙালী পন্ডিতদের কাছ থেকে জেনে নিতেন, তার পর সুরু হত বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্যগঠনের কাজ। স্বভাবতঃই অনুবাদ সোজা কাজ নয়, তার ওপর বাংলা ভাষায় সীমিত জ্ঞান নিয়ে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রম ঠিক্ রেখে উপযুক্ত অন্বয়বন্ধনে মূলানুযায়ী অর্থময় বাক্য গঠন অনুবাদকদের পক্ষে ছিল আরো কঠিন। অনুবাদের চেহারা দেখে মনে হয় বাক্যগঠনের কাজ অনুবাদকগণ নিজেরাই করতেন, পন্ডিতদের পরামর্শ বিশেষ কাজে লাগান হয়নি। মঙ্গল সমাচারে যেমন তৎসম শব্দের প্রধান্য চোখে পড়ে তেমনি প্রায়ই চোখে পড়ে ভুল বা বিকৃত বানানে তৎসম শব্দের ব্যবহার। সুতরাং গ্রন্থটির ভাষা পন্ডিতদের দ্বারা কতটা মার্জিত হয়েছিল যে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

'সুরথমেধসীয়' সম্বাদ এবং বাইবেল, এ দুটিই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে অনুবাদকদের স্বাধীনতা প্রায় থাকেই না। ধর্মগ্রন্থের বাণীকে সকল ধর্মেই মন্ত্রবৎ মান্য করা হয় এবং ধর্মাবলম্বিগণ ভাষান্তর কালে মূলের বক্তব্যকে যথাযথ ও আক্ষরিক রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। তাই এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, এমনকি অনেক সময় যথাযথ অর্থটি বজায় রাখাও অতিশয় দুরূহ কাজ। সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদক বাঙালী, সংস্কৃত ভাষাও বাংলার মাতৃস্থানীয় ভাষা। তাই অনুবাদকের পক্ষে দেবীমাহাত্ম্যের অনুবাদ করা যতটা সহজ হয়েছিল, ইংরাজীর সহায়তায় গ্রীক থেকে বাংলায় বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেরী ও তাঁর সহযোগিগণের পক্ষে ততটা সহজ হয়নি। তাছাড়া আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি কেরী যতটা মনোনিবেশ করেছিলেন, সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদক ততটা করেননি। পুঁথিটির কোথাও কোথাও তাঁর অনুবাদ ব্যাখ্যামূলক ভাবানুবাদ। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে উভয়ের উদ্দেশ্যও ছিল ভিন্ন। কেরী চেয়েছিলেন তাঁর বাংলা বাইবেল বাঙালীর ঘরে ঘরে পঠিত হোক্ এবং বাইবেল পড়ে খৃষ্টধর্মে তাদের মতি হোক্। আর আমরা আগেই বলেছি, 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' রচিত হয়েছিল রেঃ ওয়ার্ডের

প্রয়োজনে, তাঁরই ফরমাস মত। আবার অনুবাদ কর্মে সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদকের জ্ঞান ও যত্নও যে প্রশ্নাতীত নয়, তাঁর রচনা বিশ্লেষণ কালে তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু তবু তাঁর অনুবাদ যতটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে, এতো যত্ন ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমবেতভাবে চেষ্টা করেও কেরী তাঁর বাংলা বাইবেলকে ততটা স্বচ্ছন্দ ও বোধগম্য করতে পারেননি। তার কারণ তাঁদের অনুবাদের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এবং নিঃসন্দেহে উপযুক্ত বাংলা জ্ঞানের অভাব। মঙ্গলসমাচারের ভাষা তাই কৃত্রিম, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের মূল ধারা থেকে সে ভাষা বিচ্ছিন্ন একটি ব্যাতিক্রম বলেই মনে হয়। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথিপত্রে বাংলা গদ্যের যতটা পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়, মঙ্গলসমাচারের ভাষা স্পষ্টতঃই তা থেকে বিচ্যুত। অবশ্য পরবর্তী সংস্করণগুলিতে গ্রন্থটির ভাষা ক্রমান্বয়ে মার্জিত হয়েছে।

চিঠিপত্রে, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধে, ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে, পুরাণবিষয়ক কথকতায়, পর্তুগীজ পাদরিদের রচনায় ও আইনের অনুবাদে অষ্টাদশ শতকের গদ্যভাষার যে ব্যাকরণ গত স্বরূপটির আভাষ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা গদ্য একটা পূর্ণতা অর্জন করেছিল, সুনির্দ্দিষ্ট হয়েছিল তার মৌলিক রূপটি। কিন্তু অভাব ছিল সাহিত্য কর্মে বিপুলভাবে সেই গদ্যভাষা চর্চার। ভাষার দীপ্তি, ভাষার স্বচ্ছতা, স্রষ্টার মানসলোকের বিচিত্র বর্ণময় অথচ অরূপ ভাবনা পুঞ্জকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করার দুর্নিবার ক্ষমতা ভাষা অর্জন করে চর্চার মাধ্যমে। অনতিকাল পরেই যে বিপুল সৃষ্টিকর্মের বাহন তাকে হতে হবে, সে জন্য প্রস্তুত ছিল বাংলা গদ্যভাষা। কিন্তু সেদিন তার ডাক পড়েনি। উনিশ শতকের ঊষালগ্নে অনুকূল পরিবেশে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় সাধকবৃন্দের কাছ থেকে এলো সেই আহ্বান। বাইবেলের অনুবাদে, পাঠ্যপুস্তক রচনায়, সাময়িক পত্রের প্রকাশে, বিবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধের নিরন্তর চর্চায় সেই থেকে দুর্বার গতিতে সুরু হল বাংলা গদ্যের জয়যাত্রা। যুগের প্রয়োজনে জনসাধারণের পঠন-পাঠন ও চর্চায় অতি অল্পকালের মধ্যে বাংলা গদ্য যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকার গণ তাকে বলেছেন বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা। বস্তুত অষ্টাদশ শতকেই বাংলা গদ্যের এই জয়যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। এখন 'মঙ্গলসমাচার' ও 'সুরথমেধসীয় সম্বাদে'র পূর্ববর্তী সেই গদ্যভাষার কয়েকটি উদ্ধৃতি বিচার করে দেখা যাক্।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত 'শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা' একটি বৈষ্ণবীয় কড়চা। যে ভাষায় এখানে রচয়িতা মথুরাপুরীর বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে অপরিচ্ছন্ন

বলা চলে না ঃ

"…. মথুরার দক্ষিণ দিগে কংস রাজার আবাষ এবং দক্ষিণদিগ পূর্বপশ্চীম পর্য্যন্ত গড় আছে অতি উচ্চতর গড়ের মধ্যখানে এক সিবঠাকুর আছেন জে সিব কংসরাজা পূজা করিতেন মথুরার দক্ষিণে অর্দ্ধক্রোষ সান্তানুকুন্ড সেখানে ঠাকুরেরা মধুপান করিয়াছিলেন তালবনের রক্ষক ধেনুক নামে এক অসুর ছিল তাহাকে বধ করিয়াছেন সেখানে এখন তালগাছ নাঞী …." ১৯

যতিচিহ্নের অভাব এবং বানানগত ত্রুটি এখানে ধর্তব্য নয়, কারণ পুঁথিপাঠক মাত্রেই জানেন যে সে কালে এ ত্রুটি ছিল সার্বজনীন। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হল এর বাক্যের গঠন ও শব্দের রূপ। রচয়িতা বর্ণনীয় বিষয়টিকে যেন চিত্রায়িত করেছেন ছোট ছোট বাক্যে, বাক্যগুলি ত্রুটিমুক্ত। তাঁর শব্দচয়ন এ ক্রিয়াপদের ব্যবহারও প্রায় স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় এই যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত মুষ্টিমেয় বৈষ্ণবীয় নিবন্ধের বাইরে এভাষার চর্চা ছিল অতি সীমিত।

দোম আন্তোনিও বিরচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে রচিত হয়েছিল। ধর্মান্তরিত ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিও নিঃসন্দেহে বাঙালী ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের প্রশ্নোত্তরমূলক তাঁর এই গ্রন্থখানি বাংলাতেই রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু তাঁর গ্রন্থের মূল বাংলা পুঁথি পাওয়া যায় না। রোমান হরপে লিপান্তরিত রূপে গ্রন্থটির অনুলিপি এভোরার গ্রন্থাগার থেকে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন উদ্ধার করেন ও পুনরায় তাকে বাংলা অক্ষরে রূপান্তরিত করেন। অবশেষে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূল রোমান সহ ডঃ সেন কৃত বাংলা অংশটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সব লিপান্তরীকরণের ফলে শব্দের উচ্চারণগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তাতে আন্তোনিওর রচনার ধারাটি বুঝতে অসুবিধা হয়না ঃ

"ব্র। এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রতখ্যে বুঝাইবা ; কিন্তু ধর্মাধর্মো তিনি লওয়াএন, ধর্মো তিনি অধর্মো তিনি।

রো। এ সকল প্রতখ্যে বুঝাইবো যেমত জিজ্ঞাসা করহ ; ধর্মাধর্মো তিনি লওয়াএন না, ধর্মো কার্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রেপাএ; আমোরা অধর্মো কার্যো করিয়া তাহান শাস্ত্রে লঙ্ঘনা করিয়া আমোরা পাপ করি ; তিন শাস্ত্রেতে বেমতি দিন, পিশুন্যো, ভূত আর

শরীর; এই সকোল ব্রমিয়া তাহান অধর্মো আমোরা করি ; এই যে ধর্মাধর্মতোনুসারে ভোগ দিবেন ; সৎ কর্যো করি, তবে মুক্তি দিবেন অসৎ কার্যো করি , তবে কুমতি দিবেন, অসৎ কার্যো করি তবে মহা নরকে যোম তারোণা দিবেন, তিনি অধর্মো নহেন তিনি কেবল পরমো ধর্মোরাজ, তাহান ঠাই অযোথার্থ নাই।

ব্র। এসকোল কথা অতি বিলক্ষণ ; এহার মৈধে আমারদিগের শাস্তোর কহি, এই সৎ কার্য। জানামি ধর্মং নচো মে প্রবির্তি ; জানামি অধর্মো নচো মে নিবৃতির, তয়া ঋষীকেশো ঋদিস্থিতেনো যথা নিযুতোসি তথা করোমি, এই শোলোকে তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা লওয়াএন তাহা হএ করি , অধর্মো বা কি ধর্মো বা কি তাহা না জানি ; বোলে যে আমি জানিনা ধর্ম আছে কিবা না, এবং অধর্মো আছে কিবা না, যেমোন পরমেশ্বর বলেন তেমোন আমি করি শরীরে থাকিয়া, অধর্মো জানিনা, ধর্মো জানিনা ; এহার বিচার কহো আমারে এ বেধের কথা।''[২০]

লক্ষণীয় যে, আন্তোনিও রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলা গদ্যের মূল প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হননি, কারণ তিনি ছিলেন বাঙালী। বাংলা সাধুভাষার ধর্মই তাঁর রচনার ভিত্তি। অন্বয়বন্ধন ও বাক্যাংশের সংস্থাপনগত ত্রুটি থেকেও তাঁর রচনা প্রায় মুক্ত। জটিল দীর্ঘ বাক্য অপেক্ষা ছোট ছোট পূর্ণ বাক্যে তিনি তাঁর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। তবে তাঁর রচনায় বিদেশী ও পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক শব্দের যথেষ্ঠ মিশ্রণ ঘটেছে , ক্রিয়াপদে সর্বনামে ও প্রশ্নবোধক শব্দের প্রয়োগে ফুটে উঠেছে এই আঞ্চলিক প্রভাব। যে হেতু তাঁর মূল বাংলা পুঁথিটি পাওয়া যায়নি, তাই তাঁর রচনায় তৎসম শব্দের বিকৃতি জনিত ত্রুটির জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা চলে না - সে ত্রুটি রূপান্তরিত করার সময়েই ঘটে থাকবে। দোম আন্তোনিও সর্বদা জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত সমসাময়িক ভাষার কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেছেন।

পর্তুগীজ পাদরি মানোএল দা আসসুম্পসাম-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সম্ভবতঃ ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু মুদ্রিত হয় রোমান হরপে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, লিসবন থেকে। গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রীতিতে গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানবৃন্দের আচরণবিধি। দোম আন্তোনিওর মত মানুএল বাঙালী ছিলেন না। তিনি বাংলা শিখেছিলেন কিন্তু বাংলা গদ্যের প্রকৃতি আয়ত্ব করতে

পারেননি। তাঁর বাক্যের গঠনে পদের ক্রম ও অন্বয়বন্ধন বিদেশীর রচিত বাংলার মত। পরিচ্ছন্ন সাধুগদ্য তাঁর রচনায় প্রায় নেই। এজন্যই মনে হয় যে রোমান হরফে এই বাংলা গ্রন্থটি তাঁর নিজেরই রচনা। তাঁর রচনায় বহু পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, প্রচলিত বিদেশী শব্দের সমাবেশও যথেষ্ট। মানোএল লেখেন :

"গু। বিভাও করাইবে কেটা ?

শি। যাহারদিগের বিভাও, তাহারা আপনেরা বিভাও করাইবে পিতামাতার যুক্তি লইয়া ; পিতামাতাও পুত্রকন্যার বিভাও করাইতে পারে, যদি তাহারদিগের বিভাও, রাজাবন্দ হয় ঃ রাজাবন্দ হয়না যদি, পিতামাতায় কদাচিত্য বল করিতে পারিবে না বিভাও হইবার : বিভাও করণ ইচ্ছার কার্য্য। বিবাওর জোড়নি করিয়া, যাহারা বিভাও করিতে চাহে, তাহারা দুই তিন শাদিয়ের সাক্ষাতে জনে জনেরে বিভাওর মানস দিবেক : পুরুষ কহিবে : ফলানা আমি তোমারে বিভাও করিব : স্ত্রীয়ে কহিবে : ফলানা, আমি তোমার লগে বিভ্রাও হইব। তবে দুইজনের নিশান বদল করিয়া লইবেক : এ নিশান কিবা আঙ্গুটি , কিবা মালা হইতে পারে। তাহার পর বিভাও যে সময়ে হয়, সেই সময়ে হইবেক।

এহা লিখিলাম, যেন এহি দেশে পিতামাতায় বিনে কন্যার ইচ্ছায় বিভাও করায়ঃ একারণ যে স্ত্রী এমত রূপে বিভাও করে সে ভাতারকে দয়া করেনা ; এহাতে অনেক দ্বন্দ্ব বিবাদ জর্ম্মে ঃ এহি মন্দ দস্তুর না হইলে, এহা লেখি।"[২১]

একই দোষে দুষ্ট হলেও মানোএলের ভাষা কেরীর "মঙ্গলসমাচার"-এর ভাষা অপেক্ষা স্বচ্ছন্দগতি ও বোধগম্য। তার কারণ মানোএলের রচনা ক্যাথলিক খ্রীষ্টান আচরণবিধি, বাইবেলের অনুবাদ নয়। তাই কেরীর মত তাঁকে পদে পদে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়নি। শব্দ বা পদনির্বাচনেও তিনি প্রচলিত লৌকিক ভাষার নিকটবর্তী থেকেছেন, তৎসম শব্দের প্রতি অধিক আসক্তি প্রকাশ করেননি। পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা বা কথ্যভাষার ব্যাপক প্রভাব তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। তবে পর্তুগীজ ভাষায় রচিত স্বীয় গ্রন্থটির রোমান হরপে বঙ্গানুবাদ কালে মানোএল ও গ্রহণ করেছিলেন বাংলা সাধুগদ্যের ধর্মকে। চিঠি পত্রাদির ভাষাই সম্ভবতঃ তাঁর আদর্শ ছিল। কিন্তু কেরীর মত তিনিও সে ধর্মকে বজায় রাখতে পারেননি। ছোট ছোট বাক্যে যদিওবা কিছুটা সফল হয়েছেন , বাক্য একটু দীর্ঘ হয়ে পড়লেই তিনি আর সামলাতে পারেননি, 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'—বাংলা গদ্যের এই

ক্রম ভেঙ্গে পড়েছে , উদ্দেশ্য বিধেয়ের স্থান পরিবর্তনগত, পদান্বয়গত, শব্দের প্রয়োগগত, এবং বাক্যের মধ্যে পদ সংস্থাপনগত বিবিধ ত্রুটি প্রকটিত হয়েছে। তাই 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—এর ভাষাও 'মঙ্গল সমাচার' - এরই সমগোত্রীয়, 'ফিরিঙ্গিয়ানা পূর্ণ পাদরি সাহেবদের ভাষা'।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে রচিত কথকথার পুঁথিতে রামায়ণ বর্ণনার ভাষায়ও বেশ স্বাভাবিকতা আছে। অবশ্য কথকথা সংলাপ ধর্মী নাট্যরস প্রধান হয়ে থাকে। গল্প রস পরিবেশনই কথকের উদ্দেশ্য। কথকের উপকরণ হয়তো সংগৃহীত হয় রামায়ণ মহাভারত ও পুরানাদি থেকে, কিন্তু তাঁকে তা পরিবেশন করতে হয় নিজের মত করে, মুখের ভাষায়। সেটাই কথকের 'আর্ট'(art)। তাই কথকথার পুঁথির ভাষায় বাক্যের গঠনে বা অন্বয় বন্ধনে জড়তা নেই :

> '' ধনুর্ভঙ্গ কালে শীতার উৎসাহবর্দ্ধন কারণ রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ এই বাক্যে কহিতেছেন। প্রভু রঘূনাথ বহুতর চিন্তাতে কিঞ্চিত আবশ্যক নাই তুমার দাস আমি সম্মুখে বিদ্যমান আছি। যদ্যপি কৃপা পূর্বক অনুমতি হয় তবে সুমেরু প্রভৃতি যে পর্বত তাহাকে গণনা করি না। অতএব শীর্ণ শিবধনুকে উত্থান করা চালনা করা নম্র করা ভগ্ন করা আশ্চর্য নহে প্রভু।'' ২২

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ' ক্যালকাটা ক্রনিকল' পত্রিকায় প্রকাশিত এ.আপজন সাহেবের 'ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিটির ভাষাও যথেষ্ট সরল। এটি এতদ্‌বিষয়ক ইংরাজী বিজ্ঞপ্তির সরল বঙ্গানুবাদ। যদিও বিজ্ঞপ্তি মাত্র, তবুও পাঠক এতে লক্ষ্য করবেন যে সেকালে বাংলা গদ্যভাষা কতটা স্বাচ্ছন্দ লাভ করেছিল :

> '' ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের সিখিবার কারণ এক বহি অতি সিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেব লোকে বাঙ্গালা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএব সকল লোকের কেফাএত কারণ এই বহি তৈয়ার করা যাইতেছে জে ১ লোকে চাহে তাহারা মেং আবজান সাহেবের ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজি তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮ বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।'' ২৩

উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলা গদ্য যে রূপ লাভ করেছিল তাতে সাহিত্য রচিত হতেপারে। সাহিত্যের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অবাধে পরিভ্রমণের সুযোগ হয়তো বাংলা গদ্যকে অনেক পূর্বেই মহৎ সাহিত্যের আদর্শ বাহন করে তুলতে পারতো, কিন্তু সে অনুকূল পরিবেশ তখনো গড়ে

ওঠেনি। গতানুগতিক ছন্দবন্ধনের আবেশ কাটিয়ে ওঠা তখনো সহজ ছিল না। 'মঙ্গল সমাচার' এর ভাষা বাংলা গদ্যের এই প্রবহমান ধারা থেকে বিচ্যুত হলেও 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ'-এর ভাষা এই সৃজ্যমান গদ্যেরই অনুবর্তন। এ ভাষাই গোলোকনাথ, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির গদ্যসাধনায় উজ্জ্বলতর হয়েছে।

গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হলেও ১৭৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোলোকনাথ তাঁর অনুবাদ সুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন জন টমাসের পন্ডিত। 'মঙ্গল সমাচার'—এর প্রথম সংস্করণের গদ্যভাষার পাশে গোলোকনাথের ভাষাও অতিশয় সহজ সরল ও গতিময় বলে মনে হবে :

> " ... হিরণ্যক করিয়াছেন কি ভবিষ্যত আপদ ভয়েতে শতমুখ গর্ত্ত করিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল পক্ষীর শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন না জানি আজি কি দশা ঘটিল ইহা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। অনাগত ভয় দেখে নীতি শাস্ত্রেতে বিশারদ যে মুষিক রাজ তিনি শতমুখী গর্ত্ত করিয়াছেন। তারপর চিত্রগ্রীব কহিতেছেন ওহে বন্ধু হিরণ্যক কেন তুমি আমারদের সহিত সম্ভাষ কর না। আমরা তোমার নিকট আইলাম কিন্তু তুমি লুকিয়া থাকিলে একি ব্যবহার তোমার। তখন হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের কথা বুঝিয়া কিছু অপ্রস্তুত মনে সসম্ভ্রমেতে বাহিরিয়া বলিলেন। আঃ কে হে আইস ২ বন্ধু চিত্রগ্রীব এ কি আনন্দ আজি আমার সুপ্রভাতা রজনী ...।
> " ২৪

গোলোকনাথ যথাযথ ভাবে মূলানুসরনের পথে যাননি, কারণ তাঁর বিষয়বস্তু কাহিনী। হিতোপদেশের কাহিনী গুলিকে তিনি অতি সংক্ষেপে প্রধানতঃ ছোট ছোট বাক্যে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপ করার জন্য গল্পের রস ও মূলের সৌন্দর্য হয়তো ক্ষুণ্ন হয়েছে, কিন্তু প্রাপ্ত সমকালীন নিদর্শনগুলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর ভাষাকে স্বচ্ছন্দই বলতে হবে। গোলোকনাথও সংস্কৃতে পন্ডিত ছিলেন , তিনিও অনুবাদ করেছেন, কিন্তু ভাষাকে আর একটু বাংলা করার জন্য তাঁর একটা সচেতন প্রয়াস ছিল। তাই তাঁর ভাষায় তদ্ভব শব্দের প্রতি একটা ঝোঁক আছে, মাঝে মাঝেই এসে পড়েছে চলিত্ শব্দ ও ক্রিয়াপদের চলিত্ রূপ (তারপর, আইলাম, লুকিয়া লক্ষনীয়)। আমরা দেখেছি, 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ'—এর অনুবাদকও তাঁর রচনায় কোন কোন বর্ণনামূলক অংশে

এরকম স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছেন। গোলোকনাথও সরল বা নিত্য অতীত কালের ক্রিয়া রূপের স্থানে কখনো কখনো ঘটমান বর্তমান (চিত্রগ্রীব কহিতেছেন) প্রয়োগ করে ফেলেন। গঠন পর্বের বাংলা গদ্যের এগুলি বৈশিষ্ট্য। আসলে অনুবাদকগণ যখনি মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি সরিয়ে রেখে আন্তরিক প্রেরণায় নিজে থেকে নিজের মত করে বিষয় বর্ণনায় সচেষ্ট হয়েছেন, তখনি এসেছে কিছুটা সফলতা। ভাষায় শব্দের প্রয়োগগত এবং বাক্যের গঠনগত কিছু ত্রুটি গোলকনাথেরও আছে, কিন্তু সে ভাষায় যেন ফুটে উঠেছে-সমকালীন শিক্ষিত সমাজের মুখের ভাষার একটা প্রতিরূপ —স্বাভাবিকতাই তার প্রধান গুণ। গোলোকনাথ যে বাংলা ভাষার অন্তর ধর্মটি বুঝেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' ভাষার গুণাগুণ বিচার করে সমালোচকগণ সে ভাষার নানা ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে বানানগত, শব্দ প্রয়োগগত ,শব্দ সংযোজন গত, আর যতিচিহ্নের ব্যবহার গত ত্রুটি এ কালের রচনাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' গদ্য পুঁথিটিতেও এ ত্রুটি বিদ্যমান। কোন কোন সমালোচক লক্ষ্য করেছেন যে মুন্সি রামরাম বাক্যের গঠন ও অন্বয় বন্ধন নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, তারই ফলে উদ্দেশ্যের আগে বিধেয়ের অবস্থান এবং বাক্যের গঠনে 'কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম', —এই ক্রম তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে দেখা যায়।[২৫] ভুল সন্ধি ও ভুল সমাসের প্রয়োগও তাঁর রচনায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মনে হয় ভাষাকে সরল ও বোধগম্য করার দিকেই যেন রামরামের নজর ছিল বেশী, ভাষার সৌকর্য সাধন ছিল গৌণ। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'— এর ভাষার বিষয়ে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, এতে আরবি ফারসী শব্দের প্রাধান্য। কিন্তু সে কালে বহু আরবি ফারসী শব্দ ছিল বাংলা ভাষায় সুপরিচিত ও বহুল প্রচলিত। পূর্বসুরী ভারতচন্দ্রের মত রামরামও হয়তো সহজ বোধগম্যতার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণনায় আরবি ফারসী শব্দের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন। বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ রূপ নির্ণয়ে এও ছিল এক পরীক্ষা। কিন্তু সকলেই জানেন, বাংলা গদ্যে আরবি ফারসী শব্দ প্রাধান্য উইলিয়াম কেরীর অনুমোদন পায়নি। কারণ পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের মত কেরীও বিশ্বাস করতেন ''অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক।'' এজন্যই 'মঙ্গল সমাচারেও' তৎসম শব্দের প্রাধান্য। তবে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের সর্বত্রই যে এরকম বিদেশী শব্দের প্রাধান্য আছে তা নয় :

'' সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা

হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রথিত আছে সাঙ্গপাঙ্গ রূপে সামুদায়িক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেনী একেই জাতি ইহাতে আপনার পিতৃপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর ২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।''[২৬]

যতিচিহ্নের অভাবজনিত ত্রুটি ব্যতীত উদ্ধৃত অংশটি সরল বাংলা গদ্য। অনেক আগে থেকেই এই ছিল বাঙালীর নানা কাজের ভাষা, রামরামের রচনায় তা একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। 'সংপ্রতি', 'প্রবর্ত্ত', 'কিমর্থে', 'যেমত', 'এমত' ইত্যাদি শব্দের প্রতি রামরামের একটা বিশেষ আসক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাঁর সব রচনাতেই এদের দেখা যাবে। ১৮০২ সালে প্রকাশিত রামরামের 'লিপিমালা' বিদেশী শব্দের প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত। সে ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দসামঞ্জস্যে গঠিত সাধু গদ্য রচনায় পারদর্শী রামরামের পরিচয়টি যেন ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষার অপরাপর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও লিপিমালায় অনেক সংশোধিত হয়েছে। বস্তুত: লিপিমালায় রামরামের পুরাণ কথনের ভাষা স্বচ্ছন্দ সাধু গদ্য :

''এই মতে প্রেমাসক্ত সতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর ২ সমস্ত ভগিনী ও আমাত্যগনকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞস্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে কোপিত হইয়া শিবনিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মশানে তাহার অবস্থিতি হাড়মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তোমাকে নিমন্ত্রন করিলাম না। এ দেব সভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না।''[২৭]

সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদকের পুরাণ বর্ণনার ভাষা এ ভাষার অতিশয় নিকটবর্তী। তিনি লেখেন :

'' যে দুর্গাদেবী এই জগত ধারণ করিতেছেন সেই ভগবতীকে এই কথা দূত কহিলে পর। দেবী মনে ২ হাসিয়া দূতকে কহিতেছেন। হে দূত তুমি সত্যকথা কহিয়াছ মিথ্যা কিছুই কহ নাই। ত্রৈলোকোর

কর্ত্তা শুম্ভ বটে কিন্তু বিবাহের বিষয়ে আমি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শ্রবন করহ। যে আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেক ও যে আমার দর্প চূর্ণ করিবেক আর যে আমার তুল্য বলবান হইবেক সেই আমার ভর্ত্তা হইবেক। অতএব শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ আসিয়া আমাকে জয় করিয়া বিবাহ করুক গৌন করা কর্ত্তব্য নয় ॥০॥ দূত কহিতেছে হে দেবি তুমি অহঙ্কারযুক্তা হইয়াছ। আমার নিকটে এমত কথা কহিও না ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোন পুরুষ শুম্ভনিশুম্ভের সংমুখে দাঁড়াইবেক। ও অন্য দৈত্যেরদিগের অগ্রেও দেবতারা দাঁড়াইতে পারে না তুমি একা স্ত্রী কি করিবা। ইন্দ্রাদি সকল দেবতারা যাহারদের যুদ্ধেতে থাকিতে পারে না এমত শুম্ভাদীর সম্মুখে একা স্ত্রী কি করিবা। অতএব তুমি আমার কথাতে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকটে চল। তাহা যদি না করহ তবে কেশাকর্ষনেতে নির্গতগৌরবা হইয়া যাইবা।'' (সুরথমেধসীয় সম্বাদ, পুঁথির পৃষ্ঠা ২০)

মুন্সি রামরামের ভাষার সঙ্গে এ ভাষার পার্থক্য অতিসামান্য, কিন্তু তবু রামরাম যতটা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ, সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদক ততটা নন। এই অস্বাচ্ছন্দের কারণ, প্রথমতঃ যতি চিহ্নের যথেচ্ছ ও অযথা ব্যবহার, এবং দ্বিতীয়তঃ রামরামের রচনা অনুবাদ নয়, তিনি নিজের মত করে কাহিনী পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সুরথমেধসীয় সম্বাদের অনুবাদক শ্লোকানুসারে পরপর প্রায় যথাযথ অনুবাদ করে গেছেন। কাহিনী বর্ণনায় পুরাণকারের বাচনভঙ্গী ও রচনা কৌশল পরিত্যাগ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর ভাষা স্বাভাবিক হওয়ার পথে এই হল সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এজন্যই তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সামঞ্জস্য বিধানে রামরাম যতটা সফল, অনুবাদক ততটা নন। মূলানুযায়ী সমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগের মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। সমকালীন অপরাপর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রামরাম যেখানে একবার চতুর্থীর স্থানে 'কে' বিভক্তি (এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে) ব্যবহার করেছেন, সেখানে অনুবাদক নিত্য অতীত কালের ক্রিয়া রূপের স্থানে ঘটমান বর্তমান কালের রূপ (দূতকে কহিতেছেন, দূত কহিতেছে) ব্যবহার করেছেন এবং 'ও' অব্যয়ের অযথা প্রয়োগে রচনার সৌকর্যহানি ঘটিয়েছেন। রামরামের মত অন্ততঃ কিছুটা সৃষ্টিধর্মী মানসিকতা নিয়ে রচনায় যত্নবান ও অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এসব বিচ্যুতি অতিক্রম করা অনুবাদকের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

হয়তো রেঃ উইলিয়াম কেরীর নির্দ্দেশেই তাঁর মুন্সি রামরাম চেষ্টা করেছিলেন

তাঁর ভাষাকে আরো একটু বাংলা করতে, কিন্তু কথাতিরিক্ত 'আর একটুখানি নবীন আভা' –সে স্বতন্ত্র কথা। 'ইংলন্ডীয় মহাশয়গণকে দেশীয় চলন ভাষা' শিক্ষাদিতে বসে তেমন কোন বাসনা মনে হয় রামরামের ছিল না, আর সচেতন ভারে সে চেষ্টাও তিনি করেননি ।

সৃজ্যমান বাংলা গদ্যসাহিত্য পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায় একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পেলো। তাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বহু আলোচিত নাম। একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁর সুগভীর জ্ঞান এবং অন্যদিকে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্প দৃষ্টি –এই দুয়ের সমন্বয়ে তিনি সাহিত্যের উপযোগী বাংলা গদ্যের একটি আদর্শকে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সেই আদর্শই হয়েছে পরবর্তী গদ্যস্রষ্টাগণের পাথেয় –তাকে অবলম্বন করেই চলেছে গদ্যকে আরো প্রকাশধর্মী আরো স্বচ্ছন্দ ও দ্যুতিময় করে তোলার সাধনা। সমকালীন গদ্য লেখকগণের তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার পরিমাণ যেমন অনেক বেশী, তেমনি সে রচনার মানও অনেক উন্নত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রয়োজনে তিনি যেমন অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন , তেমনি স্বাধীনভাবে গ্রন্থও রচনা করেছেন। বাংলা গদ্যরচনায় পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব এই যে তিনি বহু দোষ ত্রুটি যুক্ত বাংলা গদ্যের সংস্কার সাধন করেছেন, আর তাতে এনেছেন রীতি বা style। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ভাষার সংস্কার সাধনে সংস্কৃত ভাষাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন, আবার বাংলা গদ্যের ধর্মটিও তিনি যথাযথ ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সংস্কৃত বহুল সাধুগদ্য তাঁর শাস্ত্রালোচনার ভাষা, সে ভাষার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা সমালোচকগণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত অভিমতটি হল ঃ

> ''আর যেমন মনি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকেনা কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে।'' [২৮]

তাই সে ভাষায় সমাস সন্ধিবদ্ধ তৎসম শব্দের বাহুল্য, সংস্কৃতের ন্যায় বাক্যবিন্যাস ও অন্বয়বন্ধন। কিন্তু ভাষা শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়ের এই একমাত্র পরিচয় নয়, তাঁর এই 'সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী' সংস্কৃত বহুল সাধুগদ্যও পরবর্তী কালের একমাত্র আদর্শ রূপে গৃহীত হয়নি। সেই পুরাতনপন্থী প্রাজ্ঞ ভাষা শিল্পী বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় এই জন্য যে, তিনি বাংলা গদ্যে বিষয় ও ভাবানুযায়ী ভাষার প্রবর্তন করে গেছেন। তাঁর কাহিনী বর্ণনার ভাষা তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের একটা পরিমিত মিশ্রণে গঠিত,

সে ভাষায় সংস্কৃতগন্ধী অন্বয়বন্ধন ও সমাসবদ্ধ পদসন্ধানের ততটা প্রাধান্য নেই। কাহিনী বর্ণনা কালে চরিত্রানুযায়ী তাঁর ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে, কখনো সে ভাষা তদ্ভব শব্দ প্রধান সাধুগদ্য আবার কখনো তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে চলিত ও আঞ্চলিক শব্দ। সচেতন ভাবেই মৃত্যুঞ্জয় এই নানা ভাব, নানা ভাষার প্রবর্তন করেছেন। আর তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলেই তাঁর গদ্যভাষায় ফুটে উঠেছে একটি রীতি, একটি বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গি। এই সাধুগদ্যভঙ্গিই পরবর্তী গদ্যস্রষ্টাগণের পাথেয় হয়েছে ভাষার স্বাচ্ছন্দবিধানে ও সৌকর্যসাধনে। সংস্কৃতজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়, ব্যাকরণবিৎ মৃত্যুঞ্জয়, তত্ত্বদর্শনবিৎ মৃত্যুঞ্জয়, প্রাচীনপন্থী মৃত্যুঞ্জয়, গদ্য শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়—এই সব মিলিয়ে যে ব্যাক্তি মৃত্যুঞ্জয়, তাঁর সেই ব্যাক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচনাবলীতে। তাই তাঁর রচনার মধ্যে ব্যাক্তি-মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় কখনো হারিয়ে যায় না।

বহু বিচিত্র ভাবপ্রকাশে সক্ষম ভাষাই সাহিত্যের ভাষা। পন্ডিত গোলোকনাথ ও মুন্সি রামরাম যে সেই সর্বভাব প্রকাশে সক্ষম ভাষারই অন্বেষন করছিলেন, সে তাঁদের রচনায় ভাষার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা ও বিবিধ পরীক্ষণ দেখে অনুমান করা যায়। সমকালীন সকল লেখকই লিখতে গিয়ে সাহিত্যের উপযোগী গদ্য ভাষার একটি প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অভাব অনুভব করেছেন, অল্পবিস্তর চেষ্টাও করেছেন সংস্কার সাধনের। এ কাজে 'সুরধমেধসীয় সম্বাদ'—এর অনুবাদক হয়তো পন্ডিত গোলোকনাথ, মুন্সি রামরাম বা পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের সমগোত্রীয় প্রতিভাধর নন। তাঁর রচনার পরিমাণও মাত্র ৩৭ পৃষ্ঠা, কিন্তু সে রচনায় শব্দচয়নে, বাক্যগঠনে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ও পদসংস্থাপন ইত্যাদিতে প্রায়ই যে তাঁর একটা দ্বিধান্বিত ভাব, সে হল আদর্শের অভাববোধ ও সংস্কার সাধনেরই পদক্ষেপ। কোন প্রয়োগটি সিদ্ধ ও সার্থক, বা বাক্যটি কিভাবে গঠিত হবে , এ বিষয়ে অনুবাদক যেন নিশ্চিৎ ছিলেন না। অনেকটা এজন্যই 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' গদ্য পুঁথিটিতে ধারাবাহিক ভাবে রচনার মান বজায় থাকেনি। এই যে একটা অনিশ্চিত দ্বিধার ভাব —এ শুধু তাঁর রচনাতেই নয়, সমকালীন লেখক বৃন্দের প্রায় সকল রচনাতেই এ বৈশিষ্ট্য অল্পবিস্তর দেখা যায়। কদাচিৎ হলেও, পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ও এর ব্যতিক্রম নন।

পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধু গদ্য তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সেই ওজস্বিনী ভাষার সমতুল ছন্দ ও সুর সমকালীন অপর কোন রচয়িতা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। অনুবাদে হোক ইতিহাস বর্ণনায় হোক অথবা বেদান্ত ব্যাখ্যার তর্কজাল বিস্তারেই হোক, যখনি শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে তখনি যেন এক শাস্ত্রবোদ্ধার পরম উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে সেই বিশিষ্ট ভাষায়। যুক্তি তর্কে, উপমায় অলঙ্কারে ব্যাঙ্গে বিশ্লেষণে, সংস্কৃতানুসারী সমাস সন্ধির ধ্বনিময়তায়, তা একান্তই মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি। 'সুপক্ক বদরীফলবৎ' পরিণত বাক্যের দ্যুতিময় মালা গেঁথে এই বিশিষ্ট ভাষাতেই পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শাস্ত্রব্যাখ্যা করেছেন।

দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কাহিনীতে নাস্তিকের অসদুপদেশে ক্ষুব্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য যখন শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন যেন মৃত্যুঞ্জয়ের সাধুগদ্যে এই সুর, এই ছন্দ অধিকতর উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে ঃ

> ''ইতোমধ্যে এক ধূর্ত কপট সন্নাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমাধান কি নিমিত্ত হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থ যাত্রা করিলেই বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যে ফলাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধিহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিল প্রতারক কল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানীরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে।[২৯]

পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষার পাশে '' সুরথমেধসীয় সম্বাদ'' -এর গদ্যভাষা নিতান্তই লৌকিক বলে মনে হয়। রাজা সুরথ ও মেধসমুনির কথোপকথনে অনুবাদক লেখেন :

> '' তাহার পর সেই সমাধি নামে বৈশ্য ও রাজসত্তম সুরথ এই দুই জন একত্র হইয়া যথোচিত রুপে যথাযোগ্য সভা করিয়া মেধস মুনির নিকটে বসিয়া কোন কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিল ।। রাজা সেই মুনিকে কহিয়াছিল হে মহাশয় তোমাকে এক কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি তাহা কহ। আমারদিগের যেমন সচিত্তের বশ্যতাব্যতিরেক দুঃখের নিমিত্ত কেন হয়। এবং জ্ঞানবান যে আমরা কি নিমিত্ত আমারদিগের রাজ্যেতে ও সমস্ত রাজ্যাঙ্গেতে মূর্খের ন্যায় মমত্ব হয়। এবং এই যে ব্যাক্তি ইনি পুত্র কর্তৃক ও ভৃত্য কর্তৃক ও স্ত্রী কর্তৃক ও স্বজন কর্তৃক ত্যক্ত হইয়াছেন তথাপি তাহারদিগের নিমিত্ত স্নেহবান। এবং এই রূপে ইনি ও আমি এই দুইজন দোষযুক্ত বিষয়তে মমত্বাকৃষ্টমানস হইয়াছি। অতএব মহাশয় হে বিবেকান্ধের ন্যায় মূঢ়তা আমারদিগের হইল কি নিমিত্ত ।। ইহার উত্তর মেধস মুনি সেই দুইজনকে কহিয়াছেন ।। হে মহারাজ সকল জন্তুর বিষয়গোচর জ্ঞান আছে বিষয়ও ভিন্ন ২ কেনোনা কথক ২ প্রাণি দিবান্ধ ও কথক ২,

প্রাণি রাত্রান্ধ। কথক ২ প্রাণি দিবা বা রাত্রে সমান দৃষ্টি কেবল মনুষ্যমাত্রই যে জ্ঞানী এমত নহে। যে হেতুক পশুপক্ষি মৃগাদিরো জ্ঞান আছে। সেই মৃগপক্ষির যাদৃশ জ্ঞান মনুষ্যদিগেরো তাদৃশ জ্ঞান এবং মনুষ্যদিগের যাদৃশ জ্ঞান মৃগপক্ষিদিগেরো তাদৃশ জ্ঞান অতএব উভয়েরি তুল্য জ্ঞান বটে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও এই সকল পক্ষিরা ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়াও শাবকেরদিগের চঞ্চুতে তন্ডুলাদি কণা দানেতে আদৃত আছে। হে মহারাজ মনুষ্যেরা প্রত্যুপকারের নিমিত্তে লোভক্রমেতে পুত্রেদের প্রতি সাভিলাষ হয় ইহা কি জানিতে পারনা। তথাপি সংসার স্থিতিকরিয়া মহামায়াপ্রভাবেতে মমত্বরূপ আবর্ত্ত এমত অজ্ঞানরূপ গর্ত্তেতে নিপাতিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বিস্ময় করিও না। জগতের গতি যে হরি তাহার যে মহামায়া তিনি এ জগতকে মোহিত করিয়াছেন। সেই দেবী ভগবতী মহামায়া তিনি জ্ঞানি ব্যাক্তিরো চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মোহের নিমিত্তে প্রদান করেন। সেই দেবী এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই প্রসন্না হইয়া বরদা হইলেই মনুষ্যেরদিগের মুক্তি হয়। তিনি বিশ্বস্বরূপা ও নিত্যমুক্তিকারণীভূতা ও সংসাররূপ বন্ধনের হেতু ও সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরী॥" (সুরথমেধসীয় সম্বাদ, পুঁথির পৃঃ ২-৩)

এখানে অগ্রসরমান কাহিনীর মধ্যে, রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে মেধস মুনির শাস্ত্রোপদেশের ভাষায় সেই ওজস্বীতা ও স্বচ্ছ গতিময়তা ফুটে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ অনুবাদক যেন জনসাধারণের মুখের ভাষার নিকটবর্তী হতে চেয়েছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে উপযুক্ত তদ্ভব শব্দনির্বাচন ও তৎসম শব্দের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্যবিধানে সফল হতে পারেননি। মূলানুসারী সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদগুলিও বাক্যের মধ্যে গ্রন্থন সৌকর্যের অভাবে সামঞ্জস্যহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। তাঁর ভাষার পূর্বোক্তি বিবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এবং বিশেষতঃ কাহিনী বর্ণনায় সরল বা নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার না করে পুরাঘটিত বর্তমান বা পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করার জন্য কাহিনীর প্রাণময় ধারাবাহিকতাও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ "সুরথমেধসীয় সম্বাদ" এর গদ্যভাষা সমকালীন সাহিত্যসৃজন প্রচেষ্টার একটি সাধারণ নিদর্শন। প্রায় একই কালে রচিত ভাষাশিল্পী মৃত্যুঞ্জয়ের "বত্রিশ সিংহাসন"-এর গদ্যভাষার সঙ্গে "সুরথমেধসীয় সম্বাদের" গদ্যভাষার

তুলনামূলক আলেচনায় সৃজ্যমান গদ্যসাহিত্যের উর্ধ্বগামী বন্ধুর পথ ও সে পথে অগ্রসরমান বাংলা গদ্যকে যে সব বাধা-বিপত্তি র সন্মুখীন হতে হয়েছিল, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ''বেদান্তসার'' গদ্য পুঁথিটির ভাষা ''সুরথমেধসীয় সম্বাদ''-এর ভাষা অপেক্ষা পরিণত ও ত্রুটি মুক্ত। বোদান্তসারের তত্ত্ব আলোচনায় অনুবাদক পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের মতই অধিকতর সংস্কৃতানুসারী সাধু গদ্য ভাষাকেই অবলম্বন করেছেন। ''বেদান্তসার''-এর অজ্ঞাতনামা অনুবাদক লেখেন :

> ''যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণে এক রূপে থাকেন তাঁহাকে নিত্য বলি। এতদ্রুপ পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহো নয় যে সকল কখন আছে কখন নাই অথচ নানা প্রকার হয় সে অনিত্য। যত জগত সকলি এইরূপ ঈশ্বরেতে যে প্রীতি সেই পরম পুরুষার্থ এবং অনন্ত সুখের কারণ। সংসারে যে আত্যন্তিকী প্রীতি সে যদি যৎকিঞ্চিৎকাল ঈষ্ণ সুখের কারণ হোক তথাপি সংসারের অনিত্যত্বপ্রযুক্ত যে বিচ্ছেদ সে অত্যন্ত দুঃখের কারণ কেননা প্রীতি জেমন সুখের কারণ হয় তেম্নি বিচ্ছেদে দুঃখের কারণ অতএব পরিণামদর্শী সাধুপুরুষেরা পরমেশ্বরেতেই প্রীতি করেন।''[৩০]

আর বত্রিশ সিংহাসনে পঞ্চদশী পুত্ত লিকার কাহিনীতে অনুরূপ বিষয়ে পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় লেখেন :

> '' ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারী পন্ডিত জ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানীজনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্যবস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন।''[৩১]

বস্তুত: 'বেদান্তসার' গদ্য পুঁথিটির নানা অংশে অনুবাদকের ভাষা পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধু গদ্য ভাষার অতিশয় নিকটবর্তী।

॥১০॥

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর তন্নিষ্ঠ ভক্তিভাব কাব্যেরই অনুকূল। পুরাণকার সচ্চিদানন্দস্বরূপিনী মহাশক্তির আবির্ভাব কাহিনী ও দেবীর স্তব-স্তুতি-বন্দনা গানগুলির মধ্যদিয়ে যে তন্নিষ্ঠ পরমাভক্তি নিবেদন করেছেন, উচ্চ দর্শন সমৃদ্ধ সে বাণী রচনাগুণে হয়েছে মহৎ কাব্য। পুরাণকারের অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞায় রূপায়িত এ কাব্যের অর্থ ও ভাব যেন তার ছন্দের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক অনবদ্য ঐক্যতান রূপে ধ্বনিত হয়েছে। অর্থ, ভাব ও ছন্দের এই নিবিড় বন্ধনেই এর কাব্যসৌন্দর্য। এই ঐক্যতানকে ভাষান্তরিত করতে পারাই সার্থক অনুবাদ কর্ম। যিনি তা পারেন, নিঃসন্দেহে তিনি সেই অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞারই অধিকারী। এজন্যই তত্ত্বব্যাখ্যামূলক 'বেদান্তসার' অথবা নীতিকাহিনীমূলক 'বত্রিশ সিংহাসন' বা 'হিতোপদেশ'-এর অনুবাদ অপেক্ষা কাব্যধর্মী দেবীমাহাত্ম্যের অনুবাদ অতিশয় দুরূহ। নিছক সরলার্থ ব্যতীত গদ্যভাষায় দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর সার্থক অনুবাদ প্রচেষ্টার সন্ধান মেলে না। মধ্যযুগের কবিগন কাহিনী কাব্যের অনুবাদে তানপ্রধান পয়ারছন্দকে অবলম্বন করেছিলেন, দেবীমাহাত্মের অনুবাদকগণ তার ব্যতিক্রম নন। বস্তুত: এ ছন্দের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ধীর লয় বাংলা পয়ার ছন্দে তানের প্রবাহে যুক্ত ব্যঞ্জন বা যুগ্ম ধ্বনি প্রভাবিত হয়ে, একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তুলে কবিকে দেয় নানা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা। সুদীর্ঘ কাল ধরে এই ছন্দ কাব্যরচনার বিশিষ্ট আঙ্গিক রূপে গৃহীত হয়ে এসেছে। অপরপক্ষে পয়ার ছ ন্দের এক একটি চরণ চতুর্দশ মাত্রায় পূর্ণ হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরণগুলি এক একটি পূর্ণ বাক্য। প্রকৃতপক্ষে অন্ত্যমিলের আড়ালে পয়ারছন্দে আছে এক প্রচ্ছন্ন গদ্যময়তা। যুগ যুগ ধরে এই ছন্দে রচিত হয়েছে মঙ্গল কাব্য ও জীবনীকাব্য, অনূদিত হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত। ক্রমাগত অনুশীলন, পরিমার্জন ও বহু পঠন-পাঠনের ফলে মধ্যযুগে এই ছন্দবন্ধনে বাংলা ভাষা শব্দসজ্জায়, অন্বয়বন্ধনে, পদের বিশিষ্ট ব্যবহারে ও বাক্যগঠনে একটি সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ লাভ করেছিল। পয়ার ছন্দের বিশিষ্ট সেই ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশে কবিগণও সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাই কাহিনীকাব্য দেবী মাহাত্ম্যের অনুবাদেও মধ্যযুগের কোন কোন কবি যথেষ্ঠ সফলতা লাভ করেছেন। কিন্তু উনিশ শতকের সৃজ্যমান গদ্য ভাষায় সেই সফলতা লাভ করা সম্ভব ছিল না। সে শুধু বিষয়বস্তুর কাব্যধর্মীতার জন্যই নয়, গদ্যভাষা তখনো ছিল অপরিণত - তার অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠেনি যৌবনের লাবন্য। ভাবজগতের সীমাহীন বিচিত্র

সৌন্দর্যলোকে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমনের স্বাধীনতাও তাই সে ভাষা তখনো অর্জন করেনি, সেই পূর্ণতার পথে তখন সবে শুরু হয়েছিল তার জয় যাত্রা। সুরথমেধসীয় সম্বাদ-এর অনুবাদকের দায়িত্ব ছিল বাংলা গদ্যভাষায় দেবীমাহাত্ম্যচন্ডীর সরলার্থটি প্রকাশ করার। তিনি যথাসাধ্য সে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহৎ ভক্তিরসাশ্রিত সংস্কৃত কাব্যের বাংলা গদ্যানুবাদের কোন প্রতিষ্ঠিত আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না। সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি এক পথিকৃতের গুরু দায়িত্বই পালন করেছেন। কারণ 'সুরথমেধসীয় সম্বাদ' কোন নীতি কথা নয় কোন ইতিহাস নয়, কোন 'বেদান্তসার' 'কথোপকথন' বা 'লিপিমালাও' নয় - এ এক সুপ্রাচীন ভক্তিকাব্যের বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যানুবাদ প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের সূচনা পর্বে বিবিধ রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা গদ্যভাষার সংস্কার সাধনে যে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল, অজ্ঞাতনামা রচয়িতার আলোচ্য এই গদ্য পুঁথিটি সেই সাধানারই এতাবৎকাল অজ্ঞাত একটি মূল্যবান দলিল। তাই রেভারেন্ড ওয়ার্ডের প্রয়োজনে রচিত এই ক্ষুদ্র পুঁথিটির যেমন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তেমনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অনুবাদকের গদ্যভাষার মূল্যও বড় কম নয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ দেবীমাহাত্ম্য চন্ডীর পদ্যানুবাদ করেছিলেন। অন্ধত্বের জন্য কবি আক্ষেপ করে বলেছেন :

"জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥"

ভবানীপ্রসাদের রচনার প্রধান গুণ তাঁর তদ্‌গত ভক্তিভাব ও সারল্য। পুরাণকারের মূল রচনার পাশাপাশি পয়ার ছন্দে ভবানীপ্রসাদের স্বচ্ছন্দগতি সরল পদ্যানুবাদ এবং "সুরথমেধসীয় সম্বাদ"-এর সরল গদ্যানুবাদের একটু উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের প্রতিবেদন শেষকরি। পুরাণকার লিখেছেন :

" যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

উক্ত অংশের অনুবাদে ভবানীপ্রসাদ লেখেন :

" যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে ॥"[৩২]

আর, সরল গদ্যভাষায় "সুরথমেধসীয় সম্বাদ"-এর অনুবাদক লেখেন :

" যে দেবী সকল ভূতে বুদ্ধিরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।
যে দেবী সকল ভূতে দয়ারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।
যে দেবী সকল ভূতে মাতৃরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।"
(পু : পৃ :১৮)

—— o ——

।। সুরথমেধসীয় সম্বাদ ।।

পূর্ব্বে জৈমিনি মুনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকটে গমন করিয়া কহিলেন মহাশয় তোমার নিকটে আমি ধর্ম্ম প্রস্তাব শ্রবণ করিতে আসিয়াছি। বনে সুরথ রাজার সহিত মেধস মুনির যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই কথোপকথন আমি শ্রবণ করিতে আসিয়াছি তাহা মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আজ্ঞা কর। পরে জৈমিনিকে মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন এই ক্ষণে আমার কথার সময় নয় কিন্তু তপস্যার সময়। অতএব আমি যে সময়ে ভাগুরী মুনিকে বিন্ধ্যাচলে ঐ কথা শ্রবণ করাই তৎকালে চারি পক্ষি সেই স্থানে ছিল তাহারা শ্রবণ করিয়াছে তাহাদিক্কে বল তাহারা তোমাকে শ্রবণ করাইবেক। এই কথা শুনিয়া জৈমিনি চারি পক্ষির নিকটে গিয়া তাহাদিক্কে কহিলেন তোমরা মার্কণ্ডেয় মুনির স্থানে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছ তাহা আমাকে শ্রবন করায়। পক্ষিরা কহিতেছে শ্রবন কর।। মার্কণ্ডেয় যাহা কহিয়াছেন। সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি নাম ছায়ার গর্ভজাত যাহাকে অষ্টম মনু বলিয়া কহে তাহার উৎপত্তি কহিতেছি মহামায়ার অনুগ্রহেতে যে প্রকারে সেই সাবর্ণি অষ্টম মন্বন্তরাধিপ হইয়াছেন তাহা আমা হইতে শ্রবণ করহ। পূর্ব্বে দ্বিতীয় মন্বন্তরে চৈত্র বংশোদ্ভব সুরথ নামে সমস্ত ভূমন্ডলের এক রাজা ছিলেন। তিনি ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রজা প্রতিপালন শাস্ত্রানুসারে করিতেন। কথক দিবসের পর শূকরধ্বংসী কথক লোকেরা সেই রাজার শত্রুতা আচরণ করতো উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র সেই সকল লোকের সহিত অতি প্রবলতর বলশালি সেই রাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল শূকর খাদক কর্ত্তৃক ঐ রাজা পরাজিত হইয়া আপন নগরে আসিয়া নিজ দেশের কর্ত্তা হইয়াছিল। তাহার পর সেই প্রবল শত্রুরা রাজার পুরে আসিয়া ঐ রাজাকে আক্রমণ করিয়া রাজার দুষ্ট বলবান দুরাত্মা অমাত্যদ্দের সহিত [পৃঃ ১] মিলিত হইয়া রাজার ভান্ডার ও সৈন্য অপহরণ করিয়া লইল। তাহার পর ঐ রাজা মৃগয়া করিতে যাই এই ছল করিয়া রাজ্যচ্যুত হইয়া দুঃখেতে অশ্বারোহন করিয়া একাকী বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ও সেই বনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস মুনির আশ্রম দেখিলেন সে আশ্রম অহিংসক ব্যাঘ্রাদিতে ব্যাপ্ত এবং আর ২ মুনিতে ও শিষ্যতে ব্যাপ্ত সেইস্থানে সেই মুনি কর্তৃক সৎকৃত হইয়া মুনির আশ্রমে ভ্রমন করত কিছুকাল স্থিতি করিয়া মমত্বেতে আকৃষ্টচেতন হইয়া চিন্তা করিলেন যে আমার পূর্ব্বপুরুষের পালিত যে নগর তাহা আমাকর্তৃক হীন হইয়াছে। তাহা আমার দুষ্ট ভৃত্যেরা ধর্ম্মতঃ প্রতিপালন করিতেছে কিনা। আর আমার সেই যে প্রধান মত্তহস্তী তিনি আমার শত্রু হস্তগত হইয়া কি কি

ভোজন করিতেছেন ইহা আমি জানিতে পারিলাম না। আর যে সকল লোক আমার প্রতিদিবস প্রসাদ ধন ও ভোজনদ্বারা সর্ব্বদা অনুগত ছিল। তাহারা অন্যরাজার অনুবৃত্তি নিশ্চয় করিতেছে। আর অতি দুঃখেতে সঞ্চিত যে আমার ভাণ্ডার তাহা অসম্যক ব্যয়যুক্ত ভৃত্যেরদের কর্তৃক ব্যয়িত হও তো ক্ষয় হইয়াছে। এই এই সকল আর এইরূপ অন্যপ্রকার সেইস্থানে রাজা চিন্তা করিতেছেন। এই সময় সেই আশ্রমের নিকটে এক বৈশ্যকে দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি হে এ স্থানে কি কারণ আসিয়াছ। এবং শোকগ্রস্তের ন্যায় কেনো আর তোমাকে অন্যমনস্ক দেখি কি কারণ তাহা কহ। এই প্রকার ভূপতির প্রণয়োদিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত হইয়া রাজাকে বৈশ্য কহিল। আমি বৈশ্য আমার নাম সমাধি আমি ধনি ব্যক্তির কুলে উৎপন্ন কিন্তু আসাধু ধনলুব্ধ স্ত্রীপুত্র কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া ধন ও স্ত্রী ও পুত্রতে বিহীন হইয়া দুঃখ পাইয়া বনে আসিয়াছি। সেই পুত্র ও স্ত্রী ও স্বজনেরদের এই ক্ষণ মঙ্গল কি অমঙ্গল এবং তাহারদের গৃহের মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহারা দুবৃত্ত কি সদ্বৃত্ত ইহা জানিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। রাজা কহিতেছেন যে ধনলুব্ধ পুত্র ও স্ত্রীতে [পৃঃ ২]তোমাকে দূর করিয়া দিয়াছে তাহারদিগের নিমিত্তে তোমার কেনো এত স্নেহ বৈশ্য কহিতেছে মহাশয় তুমি যে কথা আমাকে কহিতেছ তাহা সত্য বটে কিন্তু আমার মন যে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা পায়না তাহা কি করিব। যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ ও পতিস্নেহ ও স্বজনস্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাকে দূর করিয়াছে তাহারদের নিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা উৎকন্ঠিত কেন ইহা আমি জানিয়াও জানিতে পারিনাই। এবং তাহার নিমিত্ত আমার নিশ্বাস ও দৌর্ম্মনস্য সর্ব্বদা হয় ও আমার মন তাহারদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হয়না ইহাতে কি করিব ॥ ইহার পর মার্কণ্ডেয় ভাগুরিকে করিয়াছেন ॥ তাহার পর সেই সমাধি নামে বৈশ্য ও রাজসত্তম সুরথ এই দুইজন একত্র হইয়া যথোচিত রূপে যথাযোগ্য সভা করিয়া মেধস মুনির নিকটে বসিয়া কোনো কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিল ॥ রাজা সেই মুনিকে কহিয়াছিল হে মহাশয় তোমাকে এক কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি তাহা কহ। আমারদিগের যেমন স্বচিত্তের বশতাব্যতিরেকে দুঃখের নিমিত্ত কেন হয়। এবং জ্ঞানবান যে আমরা কি নিমিত্ত আমারদিগের রাজ্যতে ও সমস্ত রজ্যাঙ্গেতে মূর্খের ন্যায় মমত্ব হয়। এবং এই যে ব্যক্তি ইনি পুত্র কর্তৃক ও ভৃত্য কর্তৃক ও স্ত্রী কর্তৃক ও স্বজন কর্তৃক ত্যক্ত হইয়াছেন তথাপি তাহাদিগের নিমিত্ত স্নেহবান। এবং এই রূপে ইনি ও আমি এই দুইজন দোষযুক্ত বিষয়েতে মমত্বাকৃষ্টমানস হইয়াছি। অতএব মহাশয় হে বিবেকান্ধের ন্যায় মূঢ়তা আমারদিগের হইল কি নিমিত্ত ॥ ইহার উত্তর মেধস মুনি সেই দুইজনকে

কহিয়াছেন ।। হে মহারাজ সকল জন্তুর বিষয়গোচরে জ্ঞান আছে বিষয়ও ভিন্ন ২ কেনোনা কথক ২ প্রাণি দিবান্ধ ও কথক ২ প্রাণি রাত্রান্ধ। কথক ২ প্রাণি দিবারাত্রে সমান দৃষ্টি কেবল মনুষ্য মাত্রই যে জ্ঞানী এমত নহে। যেহেতুক পশুপক্ষি মৃগাদিরো জ্ঞান আছে। সেই মৃগপক্ষির যাদৃশ জ্ঞান মনুষ্যদিগেরো তাদৃশ জ্ঞান এবং মনুষ্যদিগের যাদৃশ জ্ঞান মৃগপক্ষিদিগেরো তাদৃশ জ্ঞান অতএব উভ [পৃ:৩] য়েরি তুল্য জ্ঞান বটে। কিন্তু দেখ জ্ঞান থাকিতেও এই সকল পক্ষিরা ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়াও শাবকেরদিগের চঞ্চুতে তন্ডলাদি কণাদানেতে আদৃত আছে। হে মহারাজ মানুষেরা প্রত্যুপকারের নিমিত্তে লোভক্রমেতে পুত্রেদের প্রতি সাভিলাষ হয় ইহা কি জানিতে পার না। তথাপি সংসার স্থিতি করিয়া মহামায়া প্রভাবেতে মমত্বরূপ আবর্ত্ত এমত অজ্ঞান রূপ গর্ত্তেতে নিপতিত হইয়াছে। এবিষয়ে বিস্ময় করিও না। জগতের গতি যে হরি তাহার যে মহামায়া তিনি এ জগতকে মোহিত করিয়াছেন। সেই যে দেবী ভগবতী মহামায়া তিনি জ্ঞানি ব্যাক্তিরো চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মোহের নিমিত্তে প্রদান করেন। সেই দেবী এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই প্রসন্ন হইয়া বরদা হইলেই মনুষ্যেরদিগের মুক্তি হয়। তিনি বিদ্যাস্বরূপা ও নিত্যামুক্তিকারনীভূতা। ও সংসাররূপ বন্ধনের হেতু ও সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরী ।। তাহার পর রাজা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।।০।। হে ভগবন হে মহামুনে যে দেবীকে মহাশয় মহামায়া বলিয়া কহিতেছেন সে দেবী কে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছেন। ও তাহার বা কি কর্ম্ম। ও সে দেবী যাহার স্বরূপা যাহা হইতে উদ্ভবা সে সকল হে মহাশয় তোমা হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। মেধস রাজাকে প্রত্যুত্তর করিতেছেন। সেই দেবী জগতস্বরূপা কিন্তু নিত্যা তিনি এই সকল জগতকে বিস্তার করিয়াছেন ।। তথাপি তাহার উৎপত্তি আমার স্থানে বহুপ্রকার শ্রবণ করহ। দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধের নিমিত্তে তিনি যে কালে আবির্ভূতা হইয়াছেন সেই কালে তাহাকে উৎপন্না করিয়া লোকে কহিয়াছে কিন্তু তিনি নিত্যা ।। কল্পান্তেতে জগত একার্নব হইলে পর শেষকে আস্তরণ করিয়া ভগবান বিষ্ণু যে কালে নিদ্রা ভজনা করিয়াছিলেন সেই কালে বিষ্ণুর কর্ণের মলাতে সমুদ্ভূত মধুকৈটভ নামেতে খ্যাত ভয়ানক [পৃঃ৪] দুই অসুর ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিকমলে থাকিয়া উগ্র দুই অসুরকে দেখিয়া ও জনার্দ্দনকে প্রসুপ্ত দেখিয়া একাগ্র হৃদয় হইয়া হরির বিবোধনের নিমিত্তে হরির নেত্রেতে কৃতালয় যে বিশ্বেশ্বরী ও জগদ্ধাত্রী ও স্থিতি সংহারকারিনী ও ভগবতী যোগনিদ্রা তাহাকে স্তব করিয়া ব্রহ্মা কহিতেছেন। তুমি হোমের মন্ত্র ও পিন্ডদানের মন্ত্রস্বরূপা ও বলিদানের মন্ত্রস্বরূপা ও উদাত্তাদি স্বর স্বরূপা ও সুধা রূপা তোমার ক্ষয় নাই তুমি এক মাত্রা ও দ্বিমাত্রা ও ত্রিমাত্রা রূপা ও অর্দ্ধমাত্রা রূপা এবং যাহার

উচ্চারণ হয়না তাহাও তুমি। তুমি সাবিত্রী ও জননী ও শ্রেষ্ঠা তুমি সকল কে ধারণ করিতেছ ও জগত সৃষ্টি করিয়াছ ও সর্ব্বদা জগতকে পালন করিতেছ। এই জগতের যে কালে সৃষ্টি ছিলনা সে কালে তুমি সৃষ্টি স্বরূপা পালনেতে স্থিতিরূপা তথা অন্তে সংহৃতি রূপা। তুমি মহাবিদ্যা ও মহামেধা ও মহামায়া ও মহাস্মৃতি ও মহামোহ। ও মহাদেবী ও মহাসুরী তুমি সকলের প্রকৃতি ও সত্বরজস্তম গুণ ধারিনী ও কাল রাত্রি ও মহারাত্রি ও মোহরাত্রি ও ভয়ানকা। তুমি লক্ষ্মী ও ঈশ্বরী ও লজ্জা ও বুদ্ধি ও বোধলক্ষ্মা ও বিশেষ লজ্জা ও পুষ্টি তুষ্টি ও শান্তি ও ক্ষমা ও খড়্গিনী ও শূলিনী ও ঘোরা ও গদিনী ও চক্রিনী ও শঙ্খিনী ও চাপিনী ও বানবিশিষ্টা ও ভুষুন্ডাস্ত্র বিশিষ্টা ও পরিঘায়ুধ বিশিষ্টা ও সৌম্যা ও সৌম্যতরা ও অশেষ সৌম্য হইতে অতি সুন্দরী। ও শ্রেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠা ও পরমেশ্বরী ও আর কিছু যে সত অসত বস্তু আছে তাহাদের সকলের যে শক্তি তাহা তুমি তোমার কি স্তব করিব। যে ব্যাক্তি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ও জগৎ পালন করে ও জগত নাশ করে [পৃঃ ৫] তাহাকে তুমি নিদ্রার বস করিয়াছ তোমাকে স্তব করিতে কে শক্ত হইবেক। বিষ্ণুকে ও আমাকে ও শিবকে তুমি শরীর গ্রহন করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে শক্ত হইবেক। অতএব এমত যে তুমি স্তুতা হইয়া আপনকার দারুন প্রভাব দ্বারায় এই দুরাধর্ষ মধুকৈটভ নামে দুই অসুরকে মেহো করহ আর শীঘ্র জগত স্বামির প্রবোধ করাও আর এই দুই মহাসুরকে হনন করিবার নিমিত্ত অচ্যুতকে বোধ করাও।। মেধস কহিতেছেন সুরথরাজাকে।। এই রূপেতে ব্রহ্মা কর্তৃক তমোগুনান্বিত দেবী স্তুতা হইয়া বিষ্ণুর প্রবোধনের নিমিত্ত ও মধুকৈটভের নাশের জন্যে বিষ্ণুর নেত্র ও মুখ ও নাসিকা ও বাহু ও মন ও বক্ষস হইতে নির্গমন করিয়া ব্রহ্মার চক্ষুগোচরে ছিলেন। সেই নিদ্রাকর্তৃক মুক্ত হইয়া জগন্নাথ উঠিয়াছিলেন ও শয্যা হইতে একার্ণবে সেই দুই অসুরকে দেখিয়াছিলেন দুরাত্মা ও অতি বীর্য্য পরাক্রম ও ক্রোধেতে রক্তবর্ণ চক্ষু ও ব্রহ্মাকে ভোজন করিতে উদ্যত এইরূপ মধুকৈটভকে দেখিয়া উঠিয়া সেই দুইএর সহিত পাঁচ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা দুইজন অতি বলেতে উন্মত্ত হইয়া ও মহামায়াতে বিমোহিত হইয়া কেশবকে কহিল আমাদের হইতে বর গ্রহন করহ। তোমার যুদ্ধেতে আমরা তুষ্ট তোমাকে হইয়াছি। ভগবান কহিয়াছিলেন। যদি আমাকে অদ্য তুষ্ট হইয়া থাকহ তবে আমার বধ্য হও তোমরা দুইজন। এই বর আমাকে তোমরা দেও অন্য বরে প্রয়োজন নাই ।। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজার নিকটে মধুকৈটভ সকল জলময় দেখিয়া ফাকি [পৃঃ৬] করিয়া কহিল যে স্থানে জলশূন্য পৃথিবী সেই স্থানে আমাদিক্কে বধ করহ।। মেধস মুনি পুনর্ব্বার রাজাকে কহিতেছে

তথাস্তু এই কথা কহিয়া শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু জঘন দেশে তাহাদিকে থুইয়া চক্রদিয়া সেই দুইজনের মস্তক ছেদন করিলেন এই প্রকারে ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হইয়া সমুৎপন্না হইয়া ছিলেন। এই দেবীর প্রভাব আমি পুনর্ব্বার কহি শ্রবন করহ ॥০॥ মেধসীয় কথোপকথনে মধুকৈটভ বধ॥০০॥ মেধসমুনি সুরথরাজাকে কহিতেছেন। পূর্ব্বকালে দেবতারদিগের রাজা ইন্দ্রের সহিত অসুরের দিগের রাজা মহিষের একশত বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ সেই যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুর কর্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইল। মহিষাসুর সকল দেবতা জয় করিয়া আপনি ইন্দ্র হইয়াছিল। তৎপর পরাজিত সকল দেবতা একত্র হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া লইয়া যে স্থানে মহাদেব এবং নারায়ণ ছিলেন সেই স্থানে গমন করিয়া দেবাসুরের যে যুদ্ধ ও মহিষাসুরের চেষ্টিত যে দেবতাদিগের অভিভবের বিস্তার তাহা কহিলেন। এবং সূর্য্যের ও ইন্দ্রের ও অগ্নির ও বায়ুর ও চন্দ্রের ও যমের ও বরুনের ও অন্য আর আর দেবতার যে যে অধিকার তাহা সে আপনি লইয়াছে। দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে নিরাকৃত দেবতারা পৃথিবীতে ভ্রমন করিতেছেন যেমত মনুষ্যেরা ভ্রমন করে। দেবতাদের শত্রুর এই সকল চেষ্টিত কহিলাম এবং আমরা শরণাপন্নও হইলাম তাহার বধ মহাশয়েরা চিন্তা করুন। দেবতাদিগের এই প্রকার বাক্য সুনিয়া মধুসূদন ও মহাদেব ক্রোধ করিলেন ভ্রূভঙ্গীদ্বারা কুটিলানন বিশিষ্ট হইলেন। তাহার পর অতি ক্রোধেতে পরিপূর্ণ [পৃঃ৭] বিষ্ণুর ও ব্রহ্মার ও মহাদেবের মুখ হইতে মহত্তেজ নির্গত হইল এবং অন্য আর আর ইন্দ্রাদি দেবতারদের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া সকল তেজ একত্র হইল যা শিখাতে সর্ব্বদিগ্ ব্যপ্ত হইয়াছে এমত অতি বড় তেজের কূট জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় দেবতারা দেখিলেন। সেই স্থানে সেই সকল দেবতার শরীর হইতে উৎপন্ন অতুল সেই তেজ একত্র হইয়া এক নারী হইল সেই নারী তেজেতে ত্রিভূবন ব্যাপন করিল। শম্ভুর যে তেজ ছিল তাহাতে সেই নারীর মুখ হইল। যমের তেজেতে তাহার কেশ হইল ও বিষ্ণুর তেজেতে বাহুসকল হইল চন্দ্রের তেজেতে স্তনদ্বয় ও ইন্দ্রের তেজেতে মধ্যদেশ হইল। বরুণের তেজেতে জঙ্ঘা ও উরু ও পৃথিবীর তেজেতে নিতম্ব ও ব্রহ্মার তেজেতে পাদদ্বয় ও সূর্যের তেজেতে পাদদ্বয়ের অঙ্গুলী। ও অষ্টবসুর তেজেতে হস্তের অঙ্গুলী ও কুবেরের তেজেতে নাসিকা ও প্রজাপতির তেজেতে তাহার দন্ত ও অগ্নির তেজেতে তিন নয়ন প্রাতঃসন্ধ্যার সায়ংসন্ধ্যার তেজেতে ভ্রূদ্বয় ও অনিলের তেজেতে শ্রবনদ্বয় হইল ও আর ২ যে যে অবশিষ্ট অঙ্গ ছিল তাহা আর আর দেবতার তেজেতে হইল এই প্রকারে দেবতাদের তেজেতে সমুদ্ভবা যিনি তাঁহার নাম শিবা ॥ পরে দেবতারদিগের তেজোরাশিতে সমুদ্ভবাকে দেখিয়া মহিষাসুর

কর্তৃক পিড়িত দেবতারা হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন। এবং মহাদেব আপন শূল হইতে একটী শূল নির্গত করিয়া তাহাকে দিলেন ও কৃষ্ণ আপনকার চক্র হইতে একটী চক্র দিলেন ও বরুণ শঙ্খ ও হুতাশন শক্তি ও বায়ু এক ধনুক তথা বানেতে পূর্ণ দুই তুন। ও ইন্দ্রের বজ্র হইতে এক বজ্র দিলেন। ও ঐরাবত হস্তীর গলার ঘন্টা দিলেন। যম আপনার দন্ড হইতে এক দন্ড দিলেন সমুদ্র পাশ অস্ত্র দিলেন। প্রজাপতি রূদ্রাক্ষ মালা দিলেন। ব্রহ্মা একটি কমন্ডলু দিলেন। দিবাকর সমস্ত রোমকূপেতে আপন রশ্মি দিলেন। ক্ষীরোদ সমুদ্র নির্ম্মল হার তথা জরা রোহিত বস্ত্রদ্বয়। তথা কর্ণের কুন্ডলদ্বয় তথা ব [পৃঃ৮] লয় তথা শূভ্র অর্দ্ধচন্দ্র তথা সকল হস্তেতে তড় তথা নির্ম্মল দুই নুপুর তথা বড় উত্তম কর্থভূষা তথা সকল অঙ্গুলীতে অলঙ্কার দিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে নির্ম্মল পরশু তথা অনেক প্রকার অস্ত্র তথা অভেদ্য অস্ত্র তথা অম্লান পদ্ম পুষ্প মালা মস্তকেতে দিলেন ও বক্ষস্থলেও দিলেন। ও পুনর্ব্বার সমুদ্র সুন্দর পদ্মপুষ্প দিলেন হিমালয় এক সিংহ বাহনার্থে ও নানা প্রকার রত্ন দিলেন। কুবের সুরাতে অশূন্য এক পানপাত্র দিলেন। এই পৃথিবী ধারণ করেন যে অনন্ত সর্ব্বনাগের ঈশ্বর তিনি মহামণিতে বিভূষিত এক নাগহারালঙ্কার তাঁহাকে দিলেন এই এই রূপে অন্য ২ দেবতা কর্তৃকো ও ভূষণদ্বারা অস্ত্রদ্বারা দেবী সন্মানিতা হইয়া অট্টাট্ট হাস্য করিয়া নাদ করিলেন।০। তাহার ভয়ানক শব্দেতে সমুদয় আকাশ পরিপূর্ণ হইল। সেই অপরিমিত মহত শব্দদ্বারা প্রতিশব্দ হইল। সেই প্রতিশব্দ শ্রবণ করিয়া সকল লোক ক্ষুব্ধ হইল ও সকল সমুদ্র কম্পিত হইল ও পৃথিবী চলিল ও সকল পর্ব্বত চলিল ও সকল দেবতারা সেই সিংহ বাহিনীকে জয় হওক ইহা বলিলেন ও মুনিসকল ভক্তি করিয়া নম্র হইয়া স্তব করিলেন। সকল অমরারিরা সচরাচর ত্রৈলোক্য সংক্ষুব্ধ দেখিয়া সন্নদ্ধ হইয়া উর্দ্ধেতে আয়ুধ করিয়া সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। আঃ কি এরে এই কথা বলিয়া ক্রোধেতে অশেষ অসুরেতে আবৃত হইয়া যে দিগে শব্দ হইয়াছিল সেই দিগে মহিষাসুর চলিল। এবং সেই স্থানে গমন করিয়া ভগবতীকে এই রূপ দেখিল তিনি তেজেতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পা [পৃঃ ৯] তাল ব্যাপন করিয়াছেন। পাদের আক্রমণেতে পৃথিবীকে নত করিতেছেন ও কিরীটেতে মেঘ স্পর্শ করিয়াছেন। ধনুকের জ্যাশব্দেতে সমস্ত পাতালকে ক্ষোভিত করিয়াছেন। সহস্র হস্তেতে চারিদিক ব্যাপিয়াছেন। তাহার পর ভগবতীর সহিত অসুরেরদের নানা প্রকার মুক্ত শস্ত্রাস্ত্র করণক দেদীপ্যমান দিগের মধ্য করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।।০০।। এইক্ষণে মহিষাসুরের সেনার ও সেনাপতির ও রথের সংখ্যা শ্রবণ করহ।

একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটীরর্ব্বুদ মেবচ।
বৃন্দং খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।
অন্নংমধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃন্দ্যাযথোত্তরং।

এই সকল উত্তর উত্তর দশগুণ সংখ্যা জানিয়া সৈন্যনিরূপণ করিয়া সংখ্যা জানাইবার কারণ অন্যগ্রন্থ হইতে ইহা লিখিলাম ।। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামে মহাসুর যুদ্ধ করিয়াছিল এবং চতুরঙ্গ বলান্নিত হইয়া চামর নামে সেনাপতি যুদ্ধ করিয়াছিল। ছয় অযুত রথেতে অন্নিত হইয়া উদগ্রনামাসুর যুদ্ধ করিয়া ছিল। এবং সহস্র অযুত রথেতে অন্নিত হইয়া মহাহনু নামে মহাসুর যুদ্ধ করিয়াছিল। পঞ্চাশৎ নিযুত রথেতে অন্নিত হইয়া অসিলোমা নামে অসুর যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং অযুতের ছয়শত রথেতে অন্নিত হইয়া আর অনেক সহস্র বৃদ্ধ গজবাজিতে আবৃত হইয়া ও আর কোটি রথেতে আবৃত হইয়া বাস্কল নামে অসুর যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং অযুতের পঞ্চাশৎ অযুত রথেতে আবৃত হইয়া বিড়ালাখ্য নামে অসুর যুদ্ধ করিয়াছিল। অন্য আর অনেক মহাসুরেরা অযুত ২ রথেতে অযুত ২ নাগেতে অযুত ২ হয়েতে আবৃত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং রথের কোটি ২ সহস্র ২ অশ্বের কোটি ২ সহস্র সহস্রেতে দন্তির কোটি ২ সহস্র সহস্রেতে আবৃত হইয়া যুদ্ধে মহিষাসুর আসিয়া তোমরেতে ভিন্দিপালেতে শক্তিতে মুষলেতে খড়্গেতে পরশুতে পট্টিশেতে যুদ্ধ করিয়াছিল। কেহ শক্তি [পৃঃ ১০] প্রক্ষেপ করিয়াছিল কেহ পাশ ক্ষেপণ করিয়াছিল। কেহ খড়্গ দ্বারা ভগবতীকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই দেবী আপন শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিয়া অনাআশে তাহারদিগের সেইসকল শস্ত্রাস্ত্র ছেদন করিলেন। এবং দেবী অকুপিত বদনা হইয়া ও সুরর্ষি কর্তৃক স্তুয়মানা হইয়া অসুর দেহেতে শস্ত্রাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। এবং সেই যে দেবীর বাহন সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া মাতার জটা কাপাইয়া অসুর সৈন্যতে ভ্রমণ করিয়াছিল। যেমত বনে হুতাশন ভ্রমণ করে। এবং রণেতে অম্বিকা যুদ্ধ করিবার সময় যে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই নিশ্বাস সকল শতশত সহস্র ২ ভূতগণ হইয়াছিল সেই সকল ভূতগণ পরশুতে ভিন্দিপালেতে পট্টিশেতে অসুরগণ নাশ করতো ভগবতীর শক্তিতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া সেই যুদ্ধ মহোৎসবে গণের মধ্যে কেহ ২ ঢক্কা কেহ শঙ্খ কেহ মৃদঙ্গ বাদ্য করিয়াছিল। তদনন্তর দেবী ত্রিশূলেতে গদাতে শক্তিবৃষ্টিতে খড়্গাদিতে করিয়া শত শত মহাসুরেরদিক্কে নষ্ট করিলেন ও তথা অন্য অনেক মহাসুরেরদিক্কে ঘন্টারবেতে মোহিত করিয়া ভূমেতে পতন করিলেন এবং কথক মহাসুরকে পাশেতে বদ্ধ করিয়া ভূমেতে আকর্ষণ করিলেন। অপর কথক ২

অসুরেরা তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতেতে দ্বিধাকৃত হইয়া ও অপর কথক গদাঘাতেতে বিপোথিত হইয়া পৃথিবীতে শয়ন করিল। কেহ কেহ মুষলেতে অত্যন্তহত হইয়া রুধির বমন করিল। কেহ কেহ শূলেতে ভিন্ন হইয়া ও কেহ কেহ শরসমূহেতে বিনির্গতনাড়িক হইয়া রণচত্বরে পড়িল। দেবপীড়ক সেনানুকারি যাহারা তাহারা এই এই রূপে প্রাণত্যাগ করিল। কোন অসুরেরা ছিন্নগ্রীবা হইল ও কোন অসুরেরা বাহু ছেদিত হইল। কোন অসুরেরা মস্তক ছেদিত হইয়া ও কোন অসুরেরা মধ্যে বিদারিত হইয়া ও কোন অসুরেরা বিছিন্নজঙ্ঘা হইয়া পৃথিবীতে [পৃঃ ১১] পড়িল। দেবী কর্তৃক কোন ২ অসুরেরা একাক্ষি ও এক চরণ ও এক বাহু হইল ও কোন কোন অসুরেরা দ্বিধাকৃত হইল। কেহ কেহ ছিন্ন শিরস্ক হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার উঠিয়া আয়ুধ গ্রহন করিয়া তূর্য্যশব্দেতে মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তাহারদের নাম কবন্ধ। সেই সকল কবন্ধ ছিন্ন মস্তক হইয়া ও খড়্গ শক্ত্যৃষ্টি হস্তে করিয়া দেবীকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ এই কথা বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। যে স্থানে সেই যুদ্ধ হইয়াছিল সেই স্থানে পতিত রথ নাগ অশ্ব অসুরেতে পৃথিবী অগম্যা হইয়াছিল। সেই অসুর সৈন্যের মধ্যেতে বারণবাজি অসুরের শোনিতেতে অনেক মহানদী বহি যাইল। ক্ষণেক কালের মধ্যে সেই অসুরেরদিগের মহাসৈন্যদিক্কে ভগবতী ক্ষয় করিয়াছিলেন। যেমত অগ্নি কাষ্ঠ তৃণ সমূহ ক্ষয় করে। এবং সেই যে সিংহ কম্পিত কেশর হইয়া মহানাদ করিয়া অসুরেরদিগের শরীর হইতে প্রাণ বাহির করিয়াছিল। দেবীর নিশ্বাসজাত গণেরা তেমিনি যুদ্ধ করিয়াছিল। দেবতারা আকাশ হইতে তাহারদিগের উপর যাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল। সুরথমেধস সম্বাদে মহিষাসুরের কথক ২ সৈন্য বধ হইল ॥০॥০॥ মেধসমুনি কহিয়াছেন সুরথরাজাকে ॥০০॥ চিক্ষুর নামে সেনাপতি সেই সৈন্যসকলকে নিহন্যমান দেখিয়া ক্রোধেতে দেবীর প্রতি যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। এবং সেই অসুর সেই দেবীকে শরবর্ষণেতে তেমত বর্ষণ করিয়াছিল যেমন সুমেরু পর্ব্বতে মেঘে তোয় বর্ষণ করে। তৎপর দেবী অবলীলাক্রমেতে তাহার শরসমূহ বাণদ্বারা ছেদন করিয়া তুরগ ও বাজির যন্তা ও ধনুঃ ও অত্যুচ্চ ধ্বজা ছেদন করিলেন। ও তাহার গাত্র বাণেতে বিদ্ধ করিলেন। সেই অসুর ছিন্নধন্না ও বিরথ ও হত অশ্ব হত সারথি হইয়া ও খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাইয়া দেবীর সিংহের মস্তকে তীক্ষ্নধার খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া অতিবেগবান হইয়া দেবীর বাম ভূজে আঘাত করিয়াছিল। তাহার খড়্গ ভগবতীর ভূজপ্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন হইল। তাহার পর সেই অসুর কোপেতে অরুণ বর্ণ লোচন করিয়া শূল গ্রহন করিল ও ভদ্রকালীর [পৃঃ১২] প্রতি সেই শূল প্রক্ষেপ করিল। আকাশ হইতে রবিবিম্বের

ন্যায় তেজেতে জাজ্বল্যমান হইয়া আগমন করিতেছে যে শূল তাহা দেখিয়া ভগবতী এক শূল প্রক্ষেপ করিলেন। সেই ভগবতীর শূল যাইয়া সেই অসুরকে ও তাহার শূলকে শতখন্ড করিয়া কাটিলেন। সেই মহিষাসুরের সেনাপতি হত হইলে পরে। চামর নামে ত্রিদশপীড়ক এক সেনাপতি গজারূঢ় হইয়া আসিয়া দেবীর প্রতি এক শক্তি ত্যাগ করিয়াছিল। ভগবতী এক হুঙ্কারেতে শীঘ্র শক্তিকে প্রভা রহিত করিয়া পৃথিবীতে পাত করিয়াছিলেন। শক্তি ভগ্না হইয়া পড়িল ইহা দেখিয়া ক্রোধযুক্ত হইয়া চামর শূল ক্ষেপন করিল। ভগবতী তাহাও বাণেতে ছেদন করিলেন। তাহার পর সিংহ এক লম্ফ দিয়া গজ কুম্ভের উপরে উঠিয়া সেই অসুরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিল।০। তাহার পর দুই ব্যক্তিতে যুদ্ধ করিতে ২ পৃথিবীতে পড়িয়া অতি দারুন প্রহার করণক যুদ্ধ করিয়াছিল। তৎপরে সিংহ বেগেতে লম্ফ দিয়া আকাশে উঠিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পড়িয়া এক চাপড়েতে চামরের মস্তক্কে শরীর হইতে পৃথক করিল।।০।।।০।। দেবী কর্তৃক শিলা বৃক্ষাদি দ্বারা উদগ্রনামা অসুর ও দন্তমুষ্টিতল দ্বারা করাল নামা অসুর নিপাতিত হইল। দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া গদাপাতেতে উদ্ধত অসুরকে চূর্ণ করিলেন। বাস্কলকে ভিন্দিপালেতে ও তাম্রকে বাণেতে ও অন্ধক্কে বাণেতে ও উগ্রাস্যকে তথা উগ্রবীর্য্যকে তথা মহাহনুকে সেই পরমেশ্বরী হনন করিলেন। শরেতে বিড়ালাক্ষের মস্তক শরীর হইতে পাত করিলেন। তথা দুর্দ্ধরকে ও দুর্ম্মুখকে শরেতে যমালয় পাঠাইলেন। এইরূপে সংক্ষীয়মান সৈন্য হইলে পর মহিষ রূপেতে মহীষাসুর সেই ভগবতীর গণেদিক্কে ত্রাসযুক্ত করিয়াছিল। এবং কোন গণেদিক্কে তুন্ড প্রহারেতে ও কাহাদিক্কে ক্ষুরক্ষেপেতে ও অন্যরদিক্কে লাঙ্গুলেতে তাড়িত করিয়া ও কাহারোদিক্কে শৃঙ্গেতে বিদারিত করিয়া ও কাহারোদিক্কে বেগেতে ও অপরকে ভয়ানক নাদেতে ও কাহারোদিক্কে ভ্রমনেতে ও অন্যকে নিশ্বাস বায়ুদ্বারা পৃথিবীতে পাড়িয়াছিল। এইরূপে প্রমথসৈন্যের দিক্কে নিপাত করিয়া দেবীর সিংহকে হনন করিতে গিয়াছিল। তৎপরে ভগ [পৃঃ ১৩] বতী তাহার প্রতি কোপ করিলেন। সেই মহাবীর্য্য অসুরও কোপেতে পৃথিবীকে ক্ষুর দ্বারা ক্ষুন্না করিল। ও শৃঙ্গ দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকলকে ক্ষেপন করিল ও মহা ভয়ানক নাদ করিতে লাগিল। তাহার বেগ ভ্রমণেতে বিক্ষুন্না হইয়া পৃথিবী শীর্ণা হইলেন। লাঙ্গুলেতে আহত হইয়া সমুদ্র সকল দিগে গমন করিতে লাগিল। কম্পিত শৃঙ্গেতে ছিন্ন হইয়া মেঘ সকল খন্ড খন্ড হইল। শ্বাসের অনিলেতে ক্ষিপ্ত হইয়া শত ২ পর্ব্বত আকাশ হইতে পড়িল। এইরূপে ক্রোধাগ্নি যুক্ত হইয়া আসিতেছে যে মহাসুর তাহাকে দেখিয়া চন্ডিকা তাহার বধের নিমিত্ত ক্রোধ করিলেন। এবং ভগবতী তাহার প্রতি পাশ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে

বদ্ধ করিলেন। ততপরে মহাযুদ্ধে পাশেতে বদ্ধ হইয়া মহাসুর মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া সিংহ হইয়া তাবৎকাল পর্য্যন্ত ছিল যাবৎ সিংহের মস্তক দেবী ছেদন না করিয়াছিলেন ততপরে সেই সিংহের মস্তক ভগবতী ছেদন করিলে পরে খড়্গচর্ম্মপানি এক পুরুষ হইল। ততপর দেবী শীঘ্র শায়কেতে সেই পুরুষকে খড়্গচর্ম্মের সহিত ছেদন করিলেন। তাহার পর সেই পুরুষ এক হস্তী হইয়া দেবীর সিংহকে শুন্ড দিয়া আকর্ষণ করিল। ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। ততপরে দেবী খড়্গেতে সেই গজের শুন্ড ছেদন করিলেন। ততপর মহাসুর পুনর্ব্বারি মহিষরূপ আশ্রয় করিয়া সচরাচর ত্রৈলোক্য পূর্ব্বের মত ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। তাহার পর জগম্মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম মধুপান করিয়া অরুনলোচনা হইয়া হাসিতে লাগিলেন। ও সে অসুরও বলবীর্য্যমদেতে উদ্ধত হইয়া নাদ করিয়াছিল ও শৃঙ্গ দ্বারা ভগবতীর প্রতি অনেক পর্ব্বত প্রক্ষেপ করিয়াছিল ।।০।।০।। অসুর কর্তৃক প্রেরিত ভূধরসকলকে শরেতে চূর্ণ করতো মদোদ্ধত মুখরাগা হইয়া গদগদ ভাষাতে এই এই কথা ভগবতী কহিয়াছিলেন।। হে মূঢ় তুই এইক্ষণ মাত্র গর্জ্জন কর। যাবত আমি মধুপান করি। মৎকর্তৃক তুমি হত হইলে দেবতারা এইক্ষণ গর্জ্জন করিবে এই কথা কহিয়া লম্ফ দিয়া মহিষের উপরে আরূঢ় হইয়া পাদেতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া কণ্ঠে শূলদ্বারা তাড়ন করিলেন। ততপর সেই মহিষ ভগবতীর পাদেতে আক্রান্ত হইয়া ভগবতীর বীর্য্যেতে সংবৃত হইয়া মুখ হইতে মহাসুর অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইল। এবং অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত যুদ্ধমান সেই যে মহাসুর ভগবতী কর্তৃক খড়্গেতে শির ছেদিত হইয়া নিপাতিত হইল। ততপর সকল দৈত্য সৈন্য হাহাকার করিয়া নষ্ট হইল। ও সকল দেবগণ পরম হর্ষিত হইয়াছিল ও দেবীকে সকল দেবতা মহর্ষিদের সহিত স্তব করিয়া ছিল। ও গন্ধর্ব্ব [পৃ:১৪] পতিরা গান করিয়াছিল ও অপ্সরারা নৃত্য করিয়াছিল। এই মার্কন্ডেয় সুরথমেধসীয় প্রস্তাবে মহিষাসুরের বধ: ।০।।০।।০।। মেধসমুনি কহিতেছেন দেবীকর্তৃক সেই দুরাত্মা অতিবলান্বিত স্বসৈন্যের সহিত নিহত হইলে দেবীকে ইন্দ্রাদি দেবতারা প্রণতি পূর্ব্বক নম্রশিরোধর হইয়া হর্ষিতে জাত যে লোমাঞ্চ তদ্বারা মনোহর দেহ হইয়া বক্ষ্যমান বাক্যদ্বারা স্তব করিয়াছিল।। যে দেবী কর্তৃক আত্মশক্তি দ্বারা এই জগত বিস্তৃত হইয়াছে এবং যে সমুদয় দেবগণের শক্তিসমূহ মূর্ত্তি স্বরূপা ও অখিল দেবগণের ও মহর্ষিদের পূজ্যা এমত যে তুমি তোমার নিকটে নত হইলাম। আমারদিকে মঙ্গল দেও ।০। এবং ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ও হর এই সকলে যে দেবীর অতুল প্রভাব ও বল বলিতে সমর্থ হয় না। সেই দেবী সকল জগত পরিপালনের নিমিত্ত ও অমঙ্গল ভয়নাশের নিমিত্ত মতি করুন। হে দেবী যে তুমি পুণ্যবান ব্যক্তির ভবনেতে লক্ষ্মীস্বরূপা ও পাপাত্মার ভবনেতে অলক্ষ্মী স্বরূপা

ও পন্ডিতেরদিগের হৃদয়েতে বুদ্ধিস্বরূপা ও সাধুব্যক্তির শ্রদ্ধা। ও কুলস্থিত জনের লজ্জা তোমাকে নমস্কার করিলাম বিশ্ব প্রতিপালন কর। তোমার এই যে অচিন্ত্য রূপ ইহা কি বর্ণনা করিব।০। ও অনেক অসুর ক্ষয়কারক যে তোমার অতিশয় বীর্য্য তাহাও বা কি বর্ণনা করিব। ও যুদ্ধে সকল দেবগণেতে তথা অসুরগণেতে তোমার যে চরিত্র তাহা বা কি বর্ণনা করিব। তুমি সকল জগতের কারণ এবং তুমি সত্বরজস্তমোযুক্তা হইলেও হরিহর ব্রহ্মা প্রভৃতি তোমাকে তমোগুণের দোষ বিশিষ্টত্ব রূপে জানিতে পারেন না। অতএব তুমি পাররহিতা ও সকলের আশ্রয় স্থান। এবং তোমার একদেশভূত যে এই জগত তাহাকে আকার বিশিষ্ট করিয়াছ অতএব তুমি পরম আদ্যাপ্রকৃতি।০। হে দেবি যে তোমার নামোচ্চারনেতে সমস্ত দেবতা সকল যজ্ঞেতে তৃপ্ত হয়। এবং পিতৃগণেরো তৃপ্তির কারণ তুমি। অতএব তোমাকে দেবমন্ত্র ও পিতৃমন্ত্র করিয়া লোকেতে কহে। হে দেবি যে তুমি মুক্তির কারণ। ও দু:খেতে অনুষ্ঠান করি যে মহাব্রত তদ্রুপা এবং বশীভূতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে যাহারা আর কিছু জানেনা ও মোক্ষার্থি ও নষ্ট সমস্ত দোষ এমত মুনিসকলও তোমার আরাধনা করে অতএব তুমি পরমবিদ্যাস্বরূপা। হে দেবি তুমি শব্দ স্বরূপা। সুন্দর বিমল ঋক বেদ ও যজুর্ব্বেদের তথা উর্দ্ধগীতেতে মনোহর পদপাঠ বিশিষ্ট সামবেদেরো আশ্রয়স্থান। অতএব তুমি বেদত্রয় স্বরূপা ও সমস্ত ঐশ্বর্যগুণ যুক্তা। [পৃ:১৫] এবং ভবেতে উৎপাদনের প্রবৃত্তি স্বরূপা ও সকল জগতের পরমার্ত্তিহন্ত্রী স্বরূপা। হে দেবি তুমি মেধা রূপা ও সমস্ত শাস্ত্রের সার ও জ্ঞাত আছ।০। তুমি দুর্গা ও দুস্তর সংসার সাগরের নৌকা তুমি। এবং সঙ্গ রহিতা। এবং বিষ্ণুর হৃদয়স্থিতা লক্ষ্মী ও মহাদেব কর্তৃক মানিতা যে গৌরী সে তুমি। হে দেবি তোমার ঈষত হাস্যযুক্ত ও নির্ম্মল ও পরিপূর্ণ চন্দ্রবিম্বানুকারি ও কনকোত্তমকান্তি কান্ত বক্ত্র দেখিয়াও যে প্রাপ্তক্রোধ মহিষাসুর তোমাকে হঠাৎ যে প্রহার করিয়াছিল সে আশ্চর্য্য। হে দেবি তোমার কুপিত ও ভ্রুকুটী করাল উদ্যছশঙ্কছবি আনন দেখিয়াও মহিষাসুর ততক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ যে করে নাই সে অতি আশ্চর্য কোন ব্যক্তি কুপিতান্তক দর্শনেতে বাঁচে। হে দেবি তুমি প্রসন্না হও। যাহার প্রতি কোপান্বিতা হও তাহার কুল নাশ করহ। ইহা এইক্ষণে জ্ঞাত হইলাম যে হেতুক তুমি বিপুল যে মহিষাসুরের কুল তুমি নাশ করিলা। হে দেবি মঙ্গলদায়িকা যে তুমি যাহারদিগের প্রতি প্রসন্না হও সেইসকল লোক জনপদে সম্মত ও তাহারদিগের ধন ও তাহারদিকের যশঃ ও তাহারদিগের ধর্ম্মবর্গঃ। ও আত্মজভৃত্য স্ত্রীযুক্ত সেই সকল লোক ধন্য। হে দেবি পূণ্যবাণ জন প্রতিদিন অতি আদৃত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে। ও স্বর্গে জায় সে সকল তোমার প্রসাদেতে। অতএব

তুমি প্রসন্না হইলে ইহালোকে ও পরলোকে ফল পায়। হে দেবি তুমি স্মৃতা হইলে সমস্ত জন্তুর ভয় নাশ কর।০। ও সুস্থলোক কর্তৃক স্মৃতা হইলে সুন্দর মতি প্রদান কর। হে দেবি তুমি দরিদ্র দুঃখ ভয়হারিনী। সকল উপকার করণেতে তোমাব্যতিরেক আদ্রচিত্ত আর কে। হে দেবি তোমাকর্তৃক এই সকল অসুর হত হইলে পর জগৎ সুস্থ্য হইয়াছে।০। আর এই সকল অসুর চিরকাল পর্য্যন্ত পাপ কর্ম্ম করিয়াছে। ইহারা যুদ্ধে মরিয়া স্বর্গে গমন করুক ইহা ভাবিয়া এই সকল অসুরকে বুঝি নষ্ট করিয়াছ। হে দেবি তুমি অসুরেরে দিক্কে দৃষ্টিতে ভস্ম করিলেনা ইহারা অস্ত্রেতে পবিত্র হইয়া স্বর্গে গমন করুক। ইহা যে বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া অসুরের মধ্যে অস্ত্রপ্রক্ষেপ করিয়াছ এ বুদ্ধি তোমার সাধ্বী ।।০।। হে দেবি তোমার উগ্র উগ্র খড়্গ প্রভাবেতে ও শূলের অগ্রকান্তি সমূহেতে অসুরের দিগের যে চক্ষু লয় হয় নাই সে তোমার চন্দ্রখন্ড যোগ্য মুখ দেখিতেছিল এই নিমিত্ত ।। হে দেবি যে তোমার শীল তথা রূপ অন্য ব্যক্তিতে অচিন্ত্য ও অতুল্য ও দুর্বৃত্তবৃত্তশমনকারি ও অসুরের দিগের বীর্য্যহরণ কারি। তুমি শত্রুর দিগের দয়া করিয়া স্বর্গে লইয়াছ হে দেবি তোমার এই পরাক্রমের উপমা কাহারো সহিত হয় না। ও তোমার যে রূপ সে শত্রুভয়কারি শিষ্টের মনোহারি। তোমার চিত্তে কৃপা ও সমরে নিষ্ঠুরতা এ সকল তোমাতেই দেখি অন্যত্র নাই ।। হে দেবি শত্রুসকলকে নষ্ট করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করিয়াছ। তথা সমর মধ্যে অসুরের দের [পৃঃ১৬] নষ্ট করিয়া স্বর্গে নীয়াছ। উন্মত্তসুরারি হইতে আমারদিগের ভয় দূর করিয়াছ অতএব তোমাকে নমস্কার ।। হে দেবি শূল দ্বারা আমারদিগে রক্ষা কর হে অম্বিকে খড়্গদ্বারা রক্ষা কর। ও ঘন্টার শব্দদ্বারা তথা চাপজ্যানি স্বণদ্বারা রক্ষা কর। হে চন্ডিকে তোমার শূল ভ্রমন করাইয়া আমারদিক্কে পূর্ব্বদিগে ও পশ্চিমদিগে ও দক্ষিনদিগে ও উত্তরদিগে রক্ষা কর ।। মনোহর রূপ যে তোমার ত্রৈলোক্য চরিতেছে এবং আর যে তোমার ভয়ানক রূপ আছে তৎদ্বারা আমাদিক্কে রক্ষা কর ও পৃথিবীকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে তোমার করপল্লবেতে ধৃত খড়্গশূল ও গদাদি যে যে অস্ত্র আছে তৎদ্বারা সর্ব্বত্র আমাদিক্কে রক্ষা কর ।।০।। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে। এইরূপে দেবতা কর্তৃক নন্দনবনোদ্ভব পুষ্পেতে তথা গন্ধেতে তথা আর ২ সামগ্রীতে জগতের মাতা অর্চ্চিতা হইয়া সমস্ত ত্রিদশকর্তৃক ভক্তি দ্বারা দিব্যধূপেতে ধূপিতা হইয়া প্রসন্ন বদনা হইয়া সমস্ত প্রণত দেবতাদিক্কে কহিয়াছিলেন হে সকল দেবতা তোমরা আমা হইতে বাঞ্ছিত বর লয় ।।০।। দেবতারা ভগবতীকে কহিয়াছিল তোমাকর্তৃক সকলি আমারদিগের কৃত হইয়াছে কিছু তার শেষ নাই। যে হেতুক আমার দিগের শত্রু মহিষাসুরকে নষ্ট করিয়াছ। যদি আমারদিক্কে বর দেও তবে তুমি আমারদিগের

স্তবেতে তোমাকে স্তব করিবেক তাহার বিত্তধনদারাদি সম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্তে বর আমাদিক্কে দেও ।০০। মেধসমুনি কহিতেছেন রাজাকে এইরূপে আপননিমিত্তে এবং জগতের নিমিত্তে দেবতা কর্তৃক ভগবতী প্রসাদিতা হইয়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হতা হইলেন ।০। এই রূপে পূর্ব্বকালে যে প্রকারে দেবশরীর হইতে তিনি জগত্রয়ের হিতের নিমিত্ত সম্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে কহিলাম। * । * । পুনর্ব্বার দুষ্ট দৈত্যদিগের বধের নিমিত্তে ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধের নিমিত্তে ও লোকের রক্ষার নিমিত্তে ও দেবতারদিগের উপকারের নিমিত্তে দেহ ধারন করিয়া গৌরী নামে সমুদ্ভূতা হইয়া ছিলেন তাহা আমি কহি তুমি শ্রবণ কর ।০০। সুরথ মেধস প্রস্তাবে মহিষাসুরের বধের পর স্তব এই পর্য্যন্ত। মেধস কহিতেছেন রাজাকে ।০। পূর্ব্বকালে শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুর কর্তৃক মদবলেতে শচীপতির ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞভাগ হৃত হইলে সেই দুই অসুর আপনারা সূর্য্যত্ব ও চন্দ্রের অধিকার ও কুবেরের অধিকার ও যমত্ব ও বরুণত্ব ও পবণত্ব ও বহ্নিকর্ম্ম করিতে লাগিল ।। তৎপর সেই দুই অসুর কর্তৃক দেবতারা বিনির্ধূত হইয়া ও ভ্রষ্টরাজ্যও পরাজিত ও হৃতাধিকার ও নিরাকৃতা হইয়া সেই অপরা [পৃ: ১৭] জিতা দেবীর স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাদিক্কে বর দিয়াছিলেন যে আপদে তোমাদিগের কর্তৃক সংস্মৃতা হইলে তৎক্ষণে তোমারদিগের আপদ নষ্ট করিব। এই বিবেচনা করিয়া দেবতারা হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তব করিয়াছিল ।০। হে দেবি দ্যোতনশিলা যে তুমি তোমাতে নমস্কার। তথা মহাদেবী তুমি ও মঙ্গলদায়িকা তুমি তোমাতে নমস্কার। ও প্রকৃতিস্বরূপা শ্রেষ্ঠা যে তুমি তোমাতে চিত্তপ্রনিধানভাজ হইয়া প্রণত হইলাম। তুমি সংহার শক্তি ও নিত্যা ও গৌরী ও ধাত্রী এমতযে তুমি তোমাতে নমস্কার। জ্যোৎস্না ও ইন্দুরূপিনী ও পরমানন্দময়ী এমত যে তুমি তোমাতে নমস্কার। কল্যাণ রূপা ও প্রণত জনের বুদ্ধিদায়িকা ও সিদ্ধিরূপা যে তুমি তোমাকে নমস্কার করিলাম। ও অসুর শক্তি ও রাজলক্ষ্মী ও সর্ব্বাণী তুমি তোমাতে নমস্কার। দুর্গা দুর্গপরা ও সারা ও সর্ব্বকারিনী ও খ্যাতি ও কৃষ্ণা ও ধূম্রা ও অতিসৌম্যা ও অতিরৌদ্রা ও জগৎ প্রতিষ্ঠারূপা ও দেবী ও কৃতিরূপা যে তুমি তোমাতে নমস্কার। যে দেবী সকল প্রাণিতে বিষ্ণুমায়া রূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতে বুদ্ধিরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার যে দেবী সকল ভূতে চেতনা রূপেতে আছেন তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতে নিদ্রা রূপেতে আছেন তাঁহাকে নমস্কার ।০। যে দেবী সকল ভূতে ক্ষুধারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার ।০। যে দেবী সকল ভূতে ছায়ারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার ।০।০। যে দেবী সকল ভূতে শক্তি রূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার ।০। যে দেবী সকল ভূতে তৃষ্ণা

রূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে ক্ষমারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতে জাতিরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতেতে লজ্জারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে শান্তি রূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে শ্রদ্ধারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে লক্ষ্মীরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে কান্তি রূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে স্মৃতি রূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে দয়ারূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে তুষ্টিরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে মাতৃরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী সকল ভূতে ভ্রান্তিরূপে আছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তথা ভূতের দেবতা তথা সমস্ত জগতে ব্যাপনশীলা তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী চিত্তরূপেতে এই জগত ব্যাপিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার।০। যে দেবী পূর্ব্বে মহিষাসুরের বধের কালে দেবতা কর্তৃক স্তুতা হইয়া আর অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত দিনেতে ইন্দ্র কর্তৃক সেবিতা হইয়াছেন যিনি তিনি মঙ্গলের কারনীভূতা সেই দেবী আমার [পৃঃ ১৮] দিগের মঙ্গল করুন আর আপদ হরন করুন। এই ক্ষণে উদ্ধত দৈত্যেতে তাপিত আমারদিগের কর্তৃক নমস্যা হইয়াছেন আর যিনি মহাদেবের নমস্যা আর যিনি ভক্তিতে নম্রমূর্তে আমারদিগের কর্তৃক স্মৃতা হইয়াছেন তিনি আমারদিক্কের মঙ্গল করুন।। মেধসমুনি কহিতেছেন রাজাকে।।০।। এই ২ রূপে স্তবাদি করিতেছেন যে দেবতারা। তাঁহারদিগের নিকট দিয়া সেই পার্ব্বতীদেবী গঙ্গার জলে স্নান করিবার নিমিত্ত চলিলেন। আর দেবতাদিক্কে কহিলেন তোমরা কার স্তব করিতেছে। তৎপর সেই দেবীর শরীরকোষ হইতে শিবা নামে এক দেবী নির্গতা হইয়া কহিলেন। ইহারা শুম্ভ দৈত্য কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া আর যুদ্ধেতে নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত হইয়া সকলে আমার স্তব করিতেছে। সেই পার্ব্বতীদেবীর শরীরকোষ হইতে যিনি নির্গতা হইয়াছিলেন তাঁহাকে সমস্তলোকে কৌষকী বলিয়া কহে।০। কৌষকী নির্গতা হইলে পূর্ব্বের যে দেবী কৃষ্ণবর্ণা হইলেন ও হিমালয় তিনি গমন করিলেন। তাহার নাম কালিকা বলিয়া রাখিল।।০।। তৎপর মনোহর পরমরূপ ধারণ করিয়াছেন যে কৌষকী। তাহাকে শুম্ভনিশুম্ভের চন্ডমুন্ড নামে দুই ভৃত্য তাহারা দেখিল। শুম্ভের নিকটে গিয়া কহিল হে মহারাজ।০। কোন যে এক সুমনোহরা স্ত্রী সে হিমালয়কে দেদীপ্যমান করিয়া বসিয়া আছে। এমত উত্তমরূপ কেহ কখন দেখে নাই। হে অসুরেশ্বর সে দেবীকে তুমি জান ও গ্রহন কর। সেই

দেবী স্ত্রীর মধ্যে রত্নও অতি চার্ব্বাঙ্গী ও দশদিগ আলো করিয়া বসিয়া আছে তুমি তাহাকে দেখিতে যোগ্য হও। হে প্রভো ত্রৈলোক্যের মধ্যে মনিগজাশ্বাদিরূপ যে সকল শ্রেষ্ঠা সামগ্রী আছে সে সকল তোমার গৃহে দীপ্তি পাইতেছে। কেনোনা ঐরাবত নামে গজশ্রেষ্ঠ ও পারিজাত বৃক্ষ ও উঁচ্চৈশ্রবা নামে ঘোটক ইন্দ্র হইতে তুমি আনিয়াছ। আর ব্রহ্মার হংসযুক্ত ও আশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠ যে বিমান ছিল তাহাও তোমার গৃহে আছে। এই যে মহাপদ্মনিধি তাহাও তুমি কুবের হইতে লইয়াছ। আর সমুদ্র কিঞ্জল্কিনী নামে পদ্মের মালা সে মালা কখন ম্লান হয় না। তাহাও তোমাকে সমুদ্র দিয়াছে। প্রতিদিন কাঞ্চন প্রসব হয় এমত যে বরুনের ছত্র তাহাও তোমার গৃহে আছে।০।০। তথা এই যে স্যন্দন শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বে ব্রহ্মার ছিল এইক্ষণে তোমার হইয়াছে ।০। যমের উৎক্রান্তিদা নামে যে শক্তি ছিল তাহাও তুমি হরণ করিয়াছ।০। বরুণের যে পাশাস্ত্র ছিল তাহা আর সমুদ্রে যত রত্ন ছিল তাহাও তোমার ভাই নিশুম্ভের গৃহে আছে। তথা বহ্নি তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হয়না এমত বস্ত্রযুগ্ম দিয়াছেন।০। হে দৈত্যেন্দ্র যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী পৃথিবীতে ছিল তাহাও তুমি আহরণ করিয়া আনিয়াছ। অতএব এই যে স্ত্রীশ্রেষ্ঠ তাহা তুমি কি হেতু গ্রহন না করিতেছ ।।০।। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে।০। চন্ডমুন্ডের বাক্য সুনিয়া শুম্ভ সেই কালে সুগ্রীব নামে দূতকে পাঠাইয়া ছিল। তুমি হিমালয় গিয়া আমার বাক্যেতে এই ২ কথা দেবীকে বলিবা।[পৃঃ১৯] যে রূপে শীঘ্র প্রীতিক্রমেতে এই স্থানে তিনি আইসেন তাহা করিবা।০। পরে যে অতি শোভন শৈলস্থানে দেবি আছেন সেই স্থানে গিয়া দেবীকে দূত মধুর বাক্যেতে কহিল। হে দেবী দৈত্যের পতি যে শুম্ভ তিনি ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর তিনি তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। যে শুম্ভের আজ্ঞা সমস্ত দেবতারা লঙ্ঘন করিতে পারেননা। আর যিনি সকল দেবতাদিক্কে জয় করিয়াছেন তিনি যে কথা কহিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। আমার সকল ত্রৈলোক্য ও আমার বশীভূত হইয়া সকল দেবতারা পশ্চাদ ২ গমন করে। আমি সকল দেবতার যজ্ঞভাগ ভোজন করি। আর ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী আছে সে সকল আমার গৃহে আছে। ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনেতে যে উঁচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া উঠিয়াছিল তাহা আনিয়া দেবতারা আমার পদানত হইয়া দিয়াছেন। আর ২ শ্রেষ্ঠ সামগ্রী যে ২ গন্ধর্বের মধ্যে ও দেবতাদের মধ্যে ও সর্পেরদিগের মধ্যে ছিল সে সকল আমার নিকটে আছে। অতএব স্ত্রীলোকের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠা তুমি আমারদের ভজনা কর।০। যে হেতুক আমরা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী সকল লইয়াছি। হে চঞ্চলাপাঙ্গি আমাকে কিম্বা আমার সদৃশ নিশুম্ভ ভ্রাতাকে তুমি ভজনা কর। আমার গৃহে তোমার পরম ঐশ্বর্য্য হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া নিশুম্ভের

কিম্বা আমার স্ত্রী হও ।।০।। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে ।।০।। যে দুর্গাদেবী এই জগত ধারণ করিতেছেন সেই ভগবতী দেবীকে এই কথা দূত কহিলে পরে। দেবী মনে ২ হাসিয়া দূতকে কহিতেছেন। হে দূত তুমি সত্য কথা কহিয়াছ মিথ্যা কিছুই কহ নাই। ত্রৈলোক্যের কর্তা শুম্ভ বটে কিন্তু বিবাহের বিষয়ে আমি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শ্রবন করহ। যে আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেক ও যে আমার দর্প চূর্ণ করিবেক আর যে আমার তুল্য বলবান হইবেক সেই আমার ভর্ত্তা হইবেক। অতএব শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ আসিয়া আমাকে জয় করিয়া বিবাহ করুক গৌণ করা কত্তর্ব্য নয় ।।০।। দূত কহিতেছে হে দেবি তুমি অহঙ্কার যুক্তা হইয়াছ। আমার নিকটে এমত কথা কহিয়োনা ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোন পুরুষ শুম্ভ নিশুম্ভের সংমুখে দাড়াইবেক। ও অন্য দৈত্যের দিগের অগ্রেও দেবতারা দাড়াইতে পারে না তুমি একা স্ত্রী কি করিবা। ইন্দ্রাদি সকল দেবতারা যাহারদের যুদ্ধেতে থাকিতে পারেন না এমত শুম্ভাদীর সন্মুখে একা স্ত্রী কি করিবা।০। অতএব তুমি আমার কথাতে শুম্ভনিশুম্ভের নিকটে চল তাহা যদি না করহ তবে কেশাকর্ষণেতে নির্গতগৌরবা হইয়া যাইবা।০। দেবী কহিতেছেন শুম্ভনিশুম্ভ এইপ্রকার বলবান বটে কি করিব আগে না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব তুমি যাও আমি যে কহিলাম তাহা সকল বল গিয়া। সে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা করিবেক। সুরথমেধস সম্বাদে দেবীর সহিত দূতের সম্বাদ। মেধস কহিতেছেন রাজাকে। এই প্রকার ভগবতীর বাক্য সুনিয়া ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যরাজের নিকটে বিস্তারিত করিয়া দূত গিয়া কহিল [পৃঃ২০] সেই দূতের সেই বাক্য সুনিয়া অসুরের রাজা ক্রোধান্নিত হইয়া দৈত্যের অধিপ ধূম্রলোচনকে কহিল হে ধূম্রলোচন শীঘ্র আপন সৈন্যযুক্ত হইয়া কেশাকর্ষণেতে বিহ্বলা করিয়া সেই দুষ্টা দেবীকে আন। তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে যদি কেহ আইসে তাহাকে নষ্ট করিবা সে দেবতা হউক কিম্বা যক্ষই হউক কিম্বা গন্ধর্ব্বই হউক।০।০। মেধসমুনি কহিতেছেন রাজাকে।০।০। শুম্ভ কর্তৃক আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র সেই দৈত্য ধূম্রলোচন ষাইট সহস্র অসুরেতে আবৃত হইয়া গিয়া হিমালয় পর্ব্বতস্থ দেবীকে দেখিয়া কহিল। হে দেবি তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট প্রীতিক্রমেতে অদ্য শীঘ্র আইস নতুবা আমি বলেতে কেশাকর্ষন করিয়া লইব। দেবী কহিতেছেন দৈত্যের ঈশ্বর তোমাকে পাঠাইয়াছে তুমিও আপনি বলবান আর অনেক সৈন্যেতে আবৃত আছ। যদি বলেতে লও তবে আমি কি করিব। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে।০।০। এই কথা ভগবতী কহিলে পর সেই অসুর ভগবতীকে ধরিতে চলিল। ও ভগবতী হুঙ্কারেতে তাহাকে ভস্ম করিলেন। তৎপর অসুরের দিগের মহাসৈন্য ক্রোধ করিয়া অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ম বাণ ও শক্তি ও পরস্বধ

অসুরের দিগের মহাসৈন্য ক্রোধ করিয়া অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ম বাণ ও শক্তি ও পরস্বধ বর্ষণ করিল। তৎপর দেবীর সিংহ কোপেতে জটা কাঁপাইয়া ভয়ানক নাদ করিয়া অসুর সেনাতে পড়িয়া মহাসুরের দিগের কাহাকে কাহাকে করপ্রহারেতে কাহাকে ২ মুখেতে অপর কাহাকে ২ অধরেতে আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিল। ও কাহারো পেট নখেতে চিরিল। কাহারো মস্তক করপ্রহারেতে পৃথক করিল। কোন ব্যক্তির বাহু কোন ব্যক্তির শির ছেদন করিল। কোন ব্যক্তির উদর হইতে রক্তপান করিল। একক্ষণের মধ্যে সকল অসুরকে দেবীর বাহন সিংহ ক্ষয় করিল। ধূম্রলোচন দেবী কর্তৃক ও সকল সৈন্য সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে এই কথা শুম্ভ সুনিয়া ক্রোধ করিয়া অধর দন্তেতে পীড়ন করিয়া চন্ডমুন্ডকে আজ্ঞা করিল। হে চন্ড হে মুন্ড অনেক সৈন্যেতে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র তোমরা দুইজন গমন কর ও সেই স্থানে গিয়া সেই দেবীকে কেশে ধরিয়া বাঁধিয়া আন। যদি সে যুদ্ধ করে তবে সকল অসুর লইয়া যুদ্ধ করিবা দেবীকে হতপ্রায়া করিয়া সিংহকে নিপাতিত করিয়া শীঘ্র বান্ধিয়া গ্রহণ করিয়া আনিও। এই পর্য্যন্ত সুরথমেধসীয় সম্বাদে শুম্ভনিশুম্ভ সেনানী ধূম্রলোচনের বধ সমাপন ।।০০।। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে।০। শুম্ভ কর্তৃক আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া চন্ডমুন্ড দুই মহাসুর চতুরঙ্গ বলান্বিত হইয়া অস্ত্র সকল উর্দ্ধ করিয়া গিয়া হিমালয় পর্ব্বতে শৃঙ্গেতে যথা সিংহের উপর বসিয়া হাসিতেছেন [যে দেবী] তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত উদ্ধত হইল। তৎপর অম্বিকাদেবী দৈত্যের দিগের প্রতি বড় ক্রোধ [পৃ:২১] করিলেন। ক্রোধেতে তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল। সেই দেবীর ললাট হইতে আর এক দেবী বাহির হইলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা ভয়ানক বদনা ও চর্তুহস্তা এক হস্তে খড়্গ এক হস্তে পাশ এক হস্তে বিচিত্র খট্টাঙ্গ ও তাঁহার গলায় মুন্ডমালা ও ব্যঘ্রচর্ম্ম পরিধানা ও লক ২ জিহ্বাতে ভয়ানকা বিস্তার বদনা রক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া শব্দেতে দিক সকল পরিপূর্ণ করিয়া বেগেতে আসিয়া মহাসুরেদিক্কে হনন করিতে লাগিলেন।০। ও সেই সকল অসুরের দিক্কে খাইতে লাগিলেন। এবং পশ্চাদ্বর্ত্তি সৈন্যদিক্কে ও অঙ্কুশ ধারি দিক্কে ও যোধা দিক্কে ও ঘন্টাবাদক অসুরেরদিক্কে এক কালে এক হস্তে গ্রহন করিয়া মুখে ক্ষেপন করিলেন। তথা তুরগের সহিত যোধাকে রথের সহিত সারথিকে মুখে নিক্ষেপ করিয়া ভয়ানক শব্দেতে কড়মড় করিয়া চর্ব্বন করিলেন। এক কে কেশ গ্রহন করিয়া অপরকে গ্রীবা গ্রহন করিয়া অন্যেকে আক্রমন করিয়া মৃত্তিকাতে পুতিলেন। অসুর কর্তৃক ত্যক্ত অস্ত্রসকল হা করিয়া মুখেতে গ্রহন করিয়া চর্ব্বন করিলেন ।। অসুরের দিগের বলবান মহাসৈন্যেরদিক্কে মর্দ্দন করিলেন। ও কাহারদিক্কে ভক্ষন করিলেন ও কাহারোদিক্কে তাড়ন করিলেন ও কাহাদিক্কে খড়্গতে

ছেদন করিলেন। ও কাহাদিক্কে খট্টাঙ্গেতে তাড়ন করিলেন ও কাহাদিক্কে দন্তাগ্রেতে চিবাইয়া নষ্ট করিলেন এই রূপে ক্ষণেক কালেতে সকল সৈন্য নিপাতিত হইল ইহা দেখিয়া চন্ড নামে অসুর অতি ভয়ানকা কালীর নিকটে গিয়া সেই ভীমাক্ষীকে শরবর্ষণেতে ও সহস্র ২ চক্রেতে আচ্ছন্ন করিল। সেই সকল চক্র কালীর মুখে প্রবেশ করিয়া শোভা পাইল। যেমন মেঘের মধ্যে সূর্যের কিরণ শোভা পায়। তাহার পর ভয়ানক বদনের মধ্যে যে দুর্দশ দশন তদ্বারা উজ্জ্বলা হইয়া ও অত্যন্ত হাসিয়া ভয়ানক শব্দ করিয়া হুহুঙ্কার করিয়া মহা খড়্গ লইয়া চন্ডের নিকট গিয়া তাহার কেশ গ্রহন করিয়া খড়্গ দিয়া শিরছেদন করিলেন। মুন্ডাসুর চন্ডকে নিপাতিত দেখিয়া কালীর নিকটে যুদ্ধ করিতে যাবা মাত্রে কালী ক্রোধে মুন্ডাসুরের মুন্ড ছেদন করিলেন। পরে হতশেষ যত সৈন্য ছিল তাহারা চন্ডমুন্ডকে নিপাতিত দেখিয়া ভয় পাইয়া চর্তুদিগে পালাইল। কালী চন্ডের শির ও মুন্ডের মুন্ড গ্রহণ করিয়া হাসিতে ২ আসিয়া চন্ডিকাকে কহিলেন। আমি তোমার নিকটে চন্ড মুন্ড দুই পশুর শির উপহার দিলাম। তুমি যুদ্ধে শুম্ভ নিশুম্ভকে নষ্ট করিবা।০।০। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে।০।০। পরে চন্ডিকা দেবী কালী দেবীকে কহিতেছেন যে হেতুক চন্ডকে ও মুন্ডকে মারিয়া তাহারদিগের মুন্ড লইয়া আমার নিকটে আসিয়াছ অতএব তোমার নাম চামুন্ডা থাকিল। এই পর্য্যন্ত সুরথ মেধসী কথনে চন্ডমুন্ড বধঃ ॥০॥০॥ মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে॥ চন্ডমুন্ড ও চন্ডমুন্ডের অনেক সৈন্য নিহত হইলে ক্রোধেতে অবশীভূতচিত্ত হইয়া দৈত্যের দিগের মধ্যে প্রতাপবান যে শুম্ভ সে সকল সৈন্যেরদিগের উদ্যোগ আদেশ করিয়াছিল। অদ্য ষড়শীতি দৈত্যেরা সকল সৈন্যের সহিত ও কম্বুকুলে জাত চতুরশীতি দৈত্যেরা নিজ সৈন্যেতে আবৃত হইয়া গমন করুক। অসুরের পঞ্চাশ [পৃঃ২২] কোটী বীরেতে সমুদ্ভব যে কুল। আর ধূম্রকুলোদ্ভব যে শত কুল তাহারা আমার আজ্ঞাতে গমন করুক। আর কালবংশোদ্ভব অসুরেরা ও দুর্হিতা বংশোদ্ভব অসুরেরা ও মুরবংশোদ্ভব অসুরেরা ও কালকেয় বংশোদ্ভব অসুরেরা আমার আজ্ঞাতে শীঘ্র উর্দ্ধেতে অস্ত্র করিয়া গমন করুক। এই আজ্ঞা করিয়া অসুরের পতিশুম্ভ আর অনেক সৈন্যেতে আবৃত হইয়া গমন করিয়াছিল। সেই মহাসৈন্য আসিতেছে। ইহা দেখিয়া ভগবতী ধনুষ্টংকারেতে পৃথিবী গগন পরিপূর্ণ করিলেন তাহার সিংহ মহাশব্দ করিল। পুনর্ব্বার দেবীর ঘন্টা শব্দেতে সেই দুই শব্দ বাড়াইল। পরে কালী বিস্তারিত আননা হইয়া এক শব্দ করিলেন॥ সেই শব্দে সকল শব্দকে জয় করিল। সেই শব্দ শুনিয়া দৈত্য সৈন্যেরা রোষান্বিত হইয়া দেবীকে ও সিংহকে ও কালীকে ঘিরিল। এই অবসরে হে মহারাজ অসুরের দিগ্গে নষ্ট করিবার নিমিত্তে ব্রহ্মার ও মহাদেবের

ও কার্ত্তিকেয়ের ও বিষ্ণুর ও ইন্দ্রের ও বরাহের ও নৃসিংহের শক্তি অতিবলান্বিত হইয়া তাহারদিগের শরীর হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া দেবতার যেমত বাহন ও যেমত ভূষণ তদ্বিশিষ্ট হইয়া চন্ডিকার নিকটে আসিয়া অসুরেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এক হস্তে জপমালা এক হস্তে কমন্ডলু করিয়া হংসযুক্ত রথেতে ব্রহ্মার শক্তি আসিয়া ছিলেন তাঁহার নাম ব্রাহ্মণী। তথা মহেশ্বরী তাঁহার দুই সর্পের বলয় অলঙ্কার ও কপালে চন্দ্রখন্ড তিনি ত্রিশূল ধারণ করিয়া বৃষেতে আরূঢ় হইয়া আইলেন। ও শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ চারি হস্তে ধারণ করিয়া গরুড়েতে আরোহন করিয়া বৈষ্ণবী আইলেন।। শক্তিহস্তা ও ময়ুরশ্রেষ্ঠ বাহন হইয়া কৌমারী আইলেন।০। ও নৃসিংহের সমান রূপ ধারণ করিয়া নারসিংহী আইলেন তাহার মস্তকে জটা নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছিল।০।০। ও বজ্র হস্তে করিয়া ঐরাবতে আরোহন করিয়া ঐন্দ্রী আইল তাঁহার সহস্র চক্ষু জেমন ইন্দ্র তেমিনি তিনি।০। পরে মহাদেব সেই সকল দেবশক্তিতে পরিবৃত হইয়া আসিয়া চন্ডিকাকে কহিলেন আমার প্রীতির নিমিত্তে অসুরের দিক্কে শীঘ্র নষ্ট কর। পরে চন্ডিকার শরীর হইতে এক ভয়ানকা দেবী নির্গতা হইলেন তাহার ধ্বনি একশত শৃগালের ধ্বনির ন্যায়।। তিনি মহাদেব [কে] কহিলেন হে ঈশ্বর তুমি দূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করিয়া তাহাদিক্কে বল যে সকল দানব যুদ্ধে আসিয়াছে তাহারা যদি জীবন ইচ্ছা করে তবে পাতালে যাউক। ও ইন্দ্র ত্রৈলোক্য গ্রহণ করুক।০। ও দেবতাগণ হবি ভোজন করুক। কিম্বা তাহারা অহঙ্কার ক্রমেতে যদি যুদ্ধ ইচ্ছা করে তবে আমার শৃগালেরা তাহারদিগের রক্ত মাংসেতে তৃপ্ত হোউক।।০।। এই কথা কহিয়া যেহেতু শিবকে তিনি দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই নিমিত্ত শিবদূতি বলিয়া তাঁহাকে লোকেতে কহিল। পরে দেবীর বাক্য সেই সকল অসুরেরা মহাদেবের স্থানে শুনিয়া ক্রো [পৃঃ২৩] ধেতে পরিপূর্ণ হইয়া যে স্থানে ভগবতী ছিলেন সেই স্থানে গমন করিল। তদনন্তর প্রথমত অসুরেরা বাণ ও শক্তি আদি বৃষ্টিদ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিল।। দেবীও তাহারদিগের প্রহৃত বাণ ও শূল ও চক্র ও পরশু প্রভৃতি বাণদ্বারা অবলীলাক্রমেতে ছেদন করিলেন। তদনন্তর অসুরেরদিগের অগ্রেতে কালী শূলদ্বারা তথা খট্টাঙ্গদ্বারা শত্রু দিক্কে নষ্ট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ও ব্রাহ্মণী কমন্ডলু জলের প্রক্ষেপেতে শত্রু দিক্কে হতবীর্য্য ও হততেজ করিলেন। মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে তথা বৈষ্ণবী চক্রেতে তথা কৌমরী শক্তিতে দৈত্যেরদিক্কে নষ্ট করিলেন, শতশত দৈত্য ও দানব ইন্দ্রানীর বজ্রপাতেতে বিদারিত হইয়া পৃথিবীতে পড়িল। তথা বরাহী তুন্ডাঘাত দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া তথা চক্রেতে বিদারিত করিয়া অনেক অসুর নষ্ট করিলেন। তথা নারসিংহী শত্রুদিক্কে নখেতে চিরিয়া ও ভক্ষণ

করিয়া ও শব্দেতে দিকসকল পরিপূর্ণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিবদূতি চন্ড হাসেতে হতচৈতন্য করিয়া অসুরের দিক্কে ভক্ষণ করিলেন। এই এই রূপে নানা প্রকার উপায়েতে মাতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরেরদিক্কে মর্দন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া সকল অসুরেরা পলায়ন করিল। পরে আপন সকল সৈন্য পলায়নপর দেখিয়া রক্তবীজ মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল।। সেই রক্তবীজের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত যদি পৃথিবীতে পড়ে তবে তাহার ন্যায় এক পুরুষ জন্মে। তাহার পরে গদা হস্তে করিয়া যুদ্ধ করিতে ছিলো যে রক্তবীজ তাহাকে ইন্দ্রানী বজ্রাঘাত করিলেন। তাহাতে তাহার শরীর হইতে অনেক রক্ত পড়িল ও সেই রক্ততে তাহার মত রূপ ও তাহার মত পরাক্রম যোধা হইল। ও তাহার শরীর হইতে যতো রক্তের বিন্দু পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার ন্যায় প্রভাব ও তাহার ন্যায় বড় ও তাহার ন্যায় সমর্থ ততো পুরুষ হইয়া মাতৃগণের সহিত অস্ত্রপাতেতে ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিল। পুনর্ব্বার ইন্দ্রানী বজ্রেতে যে কালে তাহার শরীর ক্ষত করিলেন সে কালে তাহার অনেক রক্ত পড়িল ও তাহাতে সহস্র ২ অসুর জন্মিল।। বৈষ্ণবী তাহাকে চক্রেতে ও গদাতে তাড়ন করিলেন। ও বৈষ্ণবী চক্রেতে ভিন্ন হইয়া তাহার শরীর দিয়া অনেক রুধির পড়িল ও তাহাতে ও সহস্র ২ অসুর হইয়া জগদ্ব্যাপিল।। তথা সেই রক্তবীজকে কৌমারী শক্তিতে ও বরাহী খড়্গেতে ও মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে তাড়ন করিয়া ছিলেন। সেই অসুরেরা ক্রোধযুক্ত হইয়া পৃথক ২ সকল মাতৃগণকে হনন করিয়াছিল। মাতৃগণের শক্তি শূলাদিদ্বারা সেই যুদ্ধে তাহার অঙ্গ হইতে যে রক্তসমূহ পড়িয়াছিল তাহাতে শত ২ সহস্র ২ অসুর উৎপন্ন হইয়া সকল জগদ্ব্যাপিল ও তাহা দেখিয়া দেবতারা বড় ভয় পাইলেন। সেই সকল দেবতা বিষণ্নবদন দেখিয়া চন্ডিকা কালীকে কহিতেছেন।। হে কালি হে চামুন্ডে তুমি মুখ বিস্তার কর। আমার অস্ত্রপাতে যে রক্ত পড়িবেক তাহা সকল তুমি খাও। ও আর রক্তপাতে উৎপন্ন যে সকল অসুর তাহাদিক্কেও খাও।। ইহা করিলেই সকল এ দৈত্য ক্ষয় হইবেক। তুমি অসুরের দিক্কে খাইলে যে রক্ত পড়িবেক তাহাও খাইলে আর পৃথিবী হইতে উঠিবেক না।। এই কথা বলিয়া দেবী শূলেতে তাহাকে হনন করিলেন। ও কালী তাহার রক্ত মুখদিয়া গ্রহণ করিলেন।০। সেও দেবীকে গদার বাড়ি মারিল। তাহাতে ভগবতী অল্পবেদনাও পাইলেন না।০। [পৃ:২৪] ও অসুরের শরীর হইতে অনেক রক্ত পড়িয়াছিল। তাহা সকল চামুন্ডা মুখেতে গ্রহণ করিলেন ও মুখেতে যে সকল অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল চামুন্ডা তাহাদিক্কে ও তাহাদিগের রক্তও খাইলেন। পরে দেবী শূলেতে ও বজ্রেতে ও বাণেতে ও খড়েতেও ঋষ্টিতে রক্তবীজকে মারিয়াছিলেন ও চামুন্ডা তাহারদিগের রক্ত খাইলেন। পরে

সেই রক্তবীজ নীরক্ত হইয়া সস্ত্রসমূহের সহিত পৃথিবীতে পড়িল। তাহা দেখিয়া দেবতারা মহা হর্ষযুক্ত হইলেন। ও মাতৃগণেরা মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত রক্তবীজের বধ ॥০॥০॥০॥ মেধসমুনিকে রাজা কহিলেন হে মহাশয় রক্তবীজ বধে বিচিত্র দেবীর মাহাত্ম্য আমি শুনিলাম। কিন্তু রক্তবীজ বধের পর শুম্ভ নিশুম্ভ ক্রোধযুক্ত হইয়া কি করিল ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। পরে মেধস কহিতেছেন রাজাকে রক্তবীজ মরিলে ও আর অনেক সৈন্য মরিলে পরে আর ২ অনেক সৈন্য হন্যমান দেখিয়া ক্রোধ করিয়া নিশুম্ভ প্রধান সেনার সহিত যুদ্ধে চলিল। ও নিশুম্ভের অগ্রে ও পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদ্বয়ে মহাসুরেরা ক্রোধেতে আপন আপন ওষ্ঠ দন্তেতে কামড়াইয়া দেবীকে মারিতে গেলো। পরে মহাবীর্য্য শুম্ভো ও আপন সৈন্যেতে আবৃত্ত হইয়া মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া চন্ডিকাকে নষ্ট করিতে চলিল। পরে দেবীর সহিত শুম্ভনিশুম্ভের অতি বড় যুদ্ধ হইল। যেমন দুই মেঘে জলবৃষ্টি করে এমত বানবর্ষন দুইজন করিয়াছিল। চন্ডিকা আপন বানেতে তাহারদিগের বান ছেদন করিলেন ও সেই দুই অসুরের অঙ্গে বানদ্বারা তাড়ন করিলেন। পরে নিশুম্ভ শানিত এক খড়্গ ও নির্ম্মল ঢাল লইয়া দেবীর বাহন সিংহকে এক কোপ মারিল। পরে দেবী ক্ষুরাপ্র অস্ত্রেতে তাহার খড়্গ ও চর্ম্ম ছেদন করিলেন। খড়্গ ও চর্ম্ম ছেদন হইলে অসুর এক শক্তি ক্ষেপন করিল।০। দেবী চক্রেতে তাহাও ছেদন করিলেন।০। নিশুম্ভ ক্রোধেতে অগ্নিতুল্য হইয়া শূল ফেলিয়া মারিল। পরে দেবী সেই শূল আসিতেছে দেখিয়া এক কিল মরিয়া তাহা চূর্ণ করিলেন। পরে সেই অসুর এক গদা চন্ডিকার প্রতি ক্ষেপন করিল। দেবী ত্রিশূলেতে সেই গদা ভস্ম করিলেন। পরে এক কুঠার হস্তে করিয়া আসিতেছিলো যে নিশুম্ভ তাহাকে বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে ফেলিলেন। সেই নিশুম্ভ ভাই ভূমিতে পড়িল ইহা দেখিয়া শুম্ভ ক্রোধ করিয়া রথে চড়িয়া আট হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া দেবীতে মারিতে চলিল। শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খবাদ্য করিলেন। ও দুঃসহ এক ধনুকের টঙ্কার করিলেন। তথা আপন ঘন্টাশব্দেতে দিক সকল পুরিলেন তাহা সুনিয়া দৈত্য সৈন্যেরদিগের বল হ্রাস হইল। পরে যাহা সুনিয়া মত্ত হস্তিসকল ভয় পাইয়াছিল। এমত এক মহাশব্দ সিংহ করিয়াছিল। সেই সকল শব্দেতে পৃথিবী ও আকাশ ও দিকসকল পুরিল ॥ পরে কালীদেবী লম্ফ দিয়া গগনে উঠিয়া পৃথিবীতে [পৃঃ২৫] দুই হস্ত দিয়া চাপড় মারিলেন। সেই শব্দেতে পূর্ব্বশব্দ ঢাকিল। ও শিবদূতি খট ২ করিয়া হাসিয়াছিলেন। তাহাতেই অসুর সকল ভয় পাইয়াছিল। ও শুম্ভ ক্রোধ করিয়াছিল। পরে হে দুরাত্মা তুই থাক ২ এই কথা ভগবতী শুম্ভতে যে কালে কহিলেন সেই কালে দেবতারা

আকাশে থাকিয়া ভগবতীকে কহিল হে দেবী তোমার জয় হোউক ২। শুম্ভ আসিয়া তেজ দ্বারা ভয়ানকা যে শক্তি অস্ত্র ক্ষেপন করিয়াছিল পরে ভগবতী তাহা অগ্নির পর্ব্বতের ন্যায় আসিতেছে দেখিয়া মহোল্কা নামে অস্ত্রেতে তাহা ব্যর্থ করিলেন। পরে শুম্ভ এক সিংহনাদ করিল তাহাতে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ক্ষুব্ধ হইল। পরে শুম্ভের শত ২ সহস্র ২ ত্যক্ত বাণ ভগবতী তীক্ষ্ম বাণেতে ছেদন করিলেন। ভগবতীর শত ২ সহস্র ২ ত্যক্ত বাণ শুম্ভ আপণ তীক্ষ্ম বাণেতে ছেদন করিল পরে সেই চন্ডিকা ক্রোধ করিয়া শূলেতে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। সে শূলেতে বিদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে পড়িল। পরে নিশুম্ভ চেতনা পাইয়া ধনুক ধারণ করিয়া বাণেতে চন্ডিকাকে ও কালীকে ও সিংহকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অযুতহস্ত বিশিষ্ট হইয়া চক্রেতে চন্ডিকাকে আছাদিত [আচ্ছাদিত] করিল। পরে ভগবতী চন্ডিকা তাহার সেই সকল বাণ আর চক্র আপন বাণেতে ছেদন করিলেন। পরে নিশুম্ভ এক গদা লইয়া দৈত্য সৈন্যেতে আবৃত হইয়া চন্ডিকাকে নষ্ট করিতে বেগেতে চলিল পরে গদা হস্তে আসিতেছিল যে নিশুম্ভ তাহার গদা ভগবতী শাণিত খড়্গেতে ছেদন করিলেন। পরে শূল গ্রহন করিয়া ভগবতীকে নষ্ট করিতে চলিল। ও শূল হস্তে করিয়া আসিতেছিল যে নিশুম্ভ তাহার বক্ষস্থলে ভগবতী শূল মারিলেন। ও শূলেতে ভিন্ন হইল যে তাহার হৃদয় তাহা হইতে মহাবল পরাক্রম এক পুরুষ বাহির হইয়া থাক ২ এই কথা বলিবামাত্রেই ভগবতী তাহার মস্তক খড়্গেতে ছেদন করলেন। সে অসুর পৃথিবীতে পড়িল।। সে মরিলে পর সিংহ দন্তেতে ঘাড় কামড়াইয়া আর অনেক অসুর নষ্ট করিল।। তথা কালী ও শিবদূতী এই দুইজনে অনেক অসুরের ঘাড় কামড়াইয়া নষ্ট করিলেন। কথক ২ অসুরকে শক্তিতে কৌমারী বিঁধিয়া ও কথক ২ অসুরকে ব্রাহ্মণী মন্ত্রপড়া জলেতে হতবীর্য্য করিয়া ও কথক ২ অসুরকে মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে বিঁধিয়া ও কথক ২ অসুরকে বরাহী তুন্ডাঘাতেতে চূর্ণ করিয়া ও কথক ২ অসুরকে বৈষ্ণবী চক্রেতে খন্ড খন্ড করিয়া ও কথক ২ অসুরকে ইন্দ্রানী বজ্রেতে নষ্ট করিলেন।।০।। নিশুম্ভের আর ২ যে সৈন্য ছিল তাহাদিক্কে কালী ও শিবদূতী ও সিংহ এই তিনেতে খাইয়া ফেলিল। এই পর্যন্ত নিশুম্ভ বধ হইল।।০০।।০০।। পরে মেধস কহিতেছেন রাজার নিকট।০০। প্রাণতুল্য ভাই নিশুম্ভ ও আর সৈন্যসকল মরিল ইহা দেখিয়া শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবতীকে কহিল। ওরে দুর্গে তুই আপনি বলবতী ইহা মনে ভাবিয়া অহঙ্কার করিয়ো না। কেননা ব্রাহ্মণী প্রভৃতির বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিয়া আপনি অহঙ্কার করিতেছে।।০।। দেবী কহিতেছেন অরে দুষ্ট জগতের মধ্যে.একা আমি আমাভিন্ন আর দ্বিতীয় কে আছে। এ সকল আমারি সম্পত্তি অতএব দেখ। এ সকল আমাতেই

করিলেন ও চন্ডিকা যুদ্ধস্থানে একাকিনী থাকিলেন। পরে দেবী কহিলেন আমি এই ক্ষণে পূর্ব্বের [পৃঃ২৬] সকল রূপ সম্বরণ করিয়া যুদ্ধে একাকী রহিলাম তুমি স্থির হও। অনন্তর দেবীর সহিত শুম্ভের তেমত শরবর্ষণ দ্বারা যুদ্ধ হইল। ও যাহা দেখিয়া দেবতারা ও অসুরেরা ভয় পাইয়াছিল। তথা শানিত অস্ত্রেতে ও দারুণ সস্ত্রেতে সেই দুইজনে পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইল যাহাতে সকল লোকের ভয় হয়। যে ২ দিব্য শত ২ অস্ত্র চন্ডিকা ক্ষেপন করিলেন তাহার প্রতিঘাত করে এমত অস্ত্রেতে শুম্ভ তাহা সকল ভাঁগিল। এবং যে ২ দিব্য শত ২ অস্ত্র শুম্ভ ক্ষেপন করিয়াছিল চন্ডিকা সে সকল হুহুঙ্কাদির দ্বারা ভাগিলেন। পরে শতশত বাণে আচ্ছন্ন করিল ভগবতীকে। ভগবতী কুপিতা হইয়া বাণেতে তাহার ধনুক কাটিলেন। ধনুক ছেদন হইলে পর শুম্ভ শক্তি নামে অস্ত্র ধরিল। দেবী তাহার হস্তাস্থিত শক্তিও ছেদন করিলেন। পরে একশত কৃত্রিম চন্দ্র বিশিষ্ট ও সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত এমত খড়্গ আর চর্ম্ম লইয়া দেবীর নিকটে শুম্ভ চলিল। সে আসিতেছে ইহা দেখিয়া শানিত বাণেতে তাহার খড়্গ ও সূর্য্যের রশ্মির মত নির্ম্মল চর্ম্ম ছেদন করিলেন। পরে শুম্ভ হতাশ্ব ও হত সারথি ও ছিন্ন ধনুক হইয়া এক ভয়ানক মুদ্গার লইয়া ভগবতীকে মারিতে চলিল। ভগবতী শাণিত বাণেতে আসিতেছিল যে শুম্ভ তাহার মুদ্গার কাটিলেন। তথাপি সেই অসুর বেগেতে মুষ্টি তুলিয়া ভগবতীকে মারিতে গেলো। ও সেই মুষ্টি ভগবতীর হৃদয়ে মারিল।। ও দেবী তাহার বক্ষে এক চড় মারিলেন। ও চাপড় খাইয়া সে মাটিতে পড়িল সহসা পনর্ব্বার উঠিয়া লম্ফ দিয়া দেবীকে ধরিয়া লইয়া আকাশে উঠিল। ও সেইখানে নিরাধার হইয়া চন্ডিকার সহিত অতি বড় ভয়ানক বাহুযুদ্ধ হইল।। পরে দেবী অনেক কাল পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিয়া অসুরকে ধরিয়া ঘুরাইয়া পৃথিবীতে ফেলিলেন।।০।। ও সে পৃথিবীতে পড়িয়া উঠিয়া মুষ্টি তুলিয়া বেগেতে ভগবতীকে বধ করিবার নিমিত্ত কিল মারিতে চলিল।। সেই অসুর আসিতেছে ইহা দেখিয়া ভগবতী শূলেতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে ফেলিলেন।। ও সে দেবীর শূলেতে বিক্ষত হইয়া গতপ্রাণ হইয়া সকল পর্ব্বতের সহিত ও সকল সমুদ্রের সহিত পৃথিবীকে কাপাইয়া পড়িল ।।০০।।০০।। সেই দুরাত্মা মরিলে পর অখিল প্রসন্ন হইল।। ও জগত স্বাস্থ্য হইল আকাশ নির্ম্মল হইল। ও উল্কাপাতের সহিত অনিষ্ঠ মেঘ যত পূর্ব্বে ছিল তাহা সকল সমতা হইল।। নদীসকল চলিল দেবগণ সকল হর্ষেতে নির্ভর মানস হইলেন। ও গন্ধর্বেরা গান করিতে লাগিল। কথক গন্ধর্বেরা বাদ্য বাজাইতে লাগিল। অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল। ও বায়ু চলিলেন।।০।। ও দিবাকর প্রভাবিশিষ্ট্য হইলেন। ও অগ্নিসকল জ্বলিল। ও দিগ্‌জনিত শব্দ রহিত হইল। এই পর্য্যন্ত শুম্ভবধ হইল ।।০।।০।। মেধস মুনি কহিতেছেন রাজাকে সুনহ মহাশয় দেবী

সেইসকল নষ্ট করিলে পর ইন্দ্রের সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা আপন ২ ইষ্ট লাভের নিমিত্ত প্রকাশিত বদন হইয়া সেই ক্যাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিলেন। হে দেবি দুস্থ ব্যাক্তির পীড়াহারিকা যে তুমি প্রসন্ন হও। হে অখিল জগতের মাতা হে বিশ্বের ঈশ্বরী তুমি প্রসন্ন [পৃঃ২৭] হও বিশ্ব রক্ষা কর। তুমি সকল চরাচরের ঈশ্বরী। হে দেবি যে হেতুক পৃথিবী স্বরূপা তুমি অতএব জগতের আধার রূপা তুমি। যে হেতুক জলস্বরূপা অতএব জগতকে বাড়াইতেছ তোমার বীর্য্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। হে দেবি তুমি বিষ্ণুর শক্তি অতএব তোমার বলের অন্ত নাই আর বিশ্বের বীজ তুমি ও পরম মায়ারূপাও তুমি সমস্ত জগৎ মোহযুক্ত করিয়াছ ও তুমি প্রসন্ন হইলেই পৃথিবীতে মুক্তি হয়॥ হে দেবি শিক্ষা কলপ ব্যাকরণ ও নিরুক্ত ও জ্যোতিষ ও ছন্দস ও সামবেদ ঋকবেদ যজুর্বেদ ও অথর্ব্ববেদ ও ধর্ম্মাশাস্ত্র ও পুরান ও মিমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ ও গন্ধর্বশাস্ত্র এই যে অষ্টাদশ বিদ্যা এ তোমারি রূপ। ও জগতে যত স্ত্রী আছে সে সকল তোমারি অংশ। তুমি একাই এ জগত ব্যাপিয়াছ। অতএব তোমার কি স্তুতি করিব। হে দেবি তুমি সকল প্রাণিতে আছ ও স্তুতা হইলে পর স্বর্গ ও মোক্ষ দেও। অতএব কোন প্রধান বাক্য তোমার স্তবের নিমিত্ত হইবেক॥ হে দেবি তুমি সকল লোকের হৃদয়েতে বুদ্ধিরূপে আছ হে স্বর্গমোক্ষ দায়িনি হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার। অষ্টাদশ নিমেষেতে হয় এক কাষ্ঠা সেই কাষ্ঠার ত্রিশেতে হয় এক কলা কলার ত্রিশেতে হয় ক্ষণ ক্ষণের দ্বাদশেতে হয় মূহুর্ত্ত মূহুর্ত্তের পঞ্চদশেতে হয় দিন এই সকল রূপেতে জগতের পরিপাক করিতেছ যে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। সকল মঙ্গল যাহা হইতে হয় তাহার মঙ্গল তুমি ও মঙ্গলদায়িকা ও সকল প্রয়োজন দায়িকা। ও রক্ষাকর্তৃ তুমি হে ত্র্যম্বকে হে গৌরি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। হে নারায়নি তুমি শরনাগত যে দীন ও পীড়িত তাহারদিগের পরিত্রাণেতে সর্ব্বদা আশঙ্কা তুমি আর সকলের পীড়া নষ্ট কর যে তুমি তোমাকে নমস্কার। তথা হংস যুক্ত রথেতে আসিয়া কুশাবজল দিয়া অসুর নষ্ট করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণী সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। তথা ত্রিশূল ও চন্দ্র ও সর্পধারণ করিয়া মহাবৃষে চড়িয়া যে মাহেশ্বরী আসিয়াছিলেন সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। তথা শ্রেষ্ঠ ময়ূরে চড়িয়া শক্তি ধরিয়া যে কৌমারী আসিয়াছিলেন সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার তথা শঙ্খ ও চক্র ও গদা শারঙ্গ গ্রহণ করিয়া যে বৈষ্ণবী আসিয়াছিলেন সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার॥০॥০॥ মহাচক্র ধারণ ও দন্তেতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন যে বরাহী সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। উগ্র নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যসৈন্য নষ্ট

করিয়াছেন আর ত্রৈলোক্যের ত্রাণ করিতেছেন যে নারসিংহী সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার ।। তথা কিরীটিনী বজ্র বিশিষ্টা ও সহস্র নয়নেতে উজ্জ্বলা ও বৃত্রাসুরের প্রাণহরা যে ঐন্দ্রী সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। তথা শিবদূতী রূপে দৈত্য হনন কারিনী ও মহা বলবতী ও ঘোররূপা ও মহাশব্দকারিনী যে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার। তথা দন্তেতে ভয়ানক বদনা ও মস্তক মালাধারিনী ও চন্ড মুন্ড নাশিনী যে চামুন্ডা সে তুমি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার ।। তুমি লক্ষ্মী ও লজ্জা ও মহাবিদ্যা ও[পৃঃ২৮] শ্রদ্ধা ও পুষ্টি ও স্বধা ও নিত্যা ও মহারাত্রি হে নারায়নি তোমাকে নমস্কার ।০। তথা তুমি মেধা ও সরস্বতী ও শ্রেষ্ঠা ও পিশাচী ও বিষ্ণুরূপা ও শিবরূপাও ও অদৃষ্ট রূপা ও ঈশ্বর রূপা হে নারায়নি তুমি প্রসন্না হও তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বস্বরূপা ও সকলের কর্ত্রী ও সকল শক্তিযুক্ত অতএব আমাদিক্কে ভয় হইতে রক্ষা কর হে দুর্গে তোমাকে নমস্কার ।। এই যে তোমার তিন চক্ষুযুক্ত মনোহর বদন আমাদিক্কে সকল ভূত হইতে রক্ষা করুক হে কাত্যায়নি তোমাকে নমস্কার। তথা জ্বালাতে ভয়ানক ও অতুগ্র ও অশেষ দৈত্য নষ্ট করিয়াছে যে তোমার ত্রিশূল সে আমাদিক্কে ভয় হইতে রক্ষা করুক হে ভদ্রকালি তোমাকে নমস্কার। তথা তোমার যে ঘন্টাশব্দেতে জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দৈত্যে [র] দিগের তেজ নষ্ট করিয়াছে সেই ঘন্টা আমাদিক্কে রক্ষা করুক যেমন পাপ হইতে পুত্রেদিক্কে পিতা রক্ষা করেন তথা কিরণেতে উজ্জ্বল আর অসুরেদ্দের রক্ত ও মাংসের কর্দ্দমেতে চর্চ্চিত যে তোমার খড়্গ সে আমাদিক্কে মঙ্গল করুক। হে চন্ডিকে তোমাকে নমস্কার। তুমি তুষ্ট হইলে অশেষ রোগ নষ্ট কর ও রুষ্ট হইলে সকল অভিষ্ট নষ্ট কর তথা তোমাকে আশ্রয় যে করে তাহার বিপদ হয় না। আর তোমাকে আশ্রয় যে করিয়াছে সে আশ্রয় পাইয়াছে হে দেবি আপনি আপনার মূর্ত্তি অনেক প্রকারে করিয়া অনেক ২ রূপেতে এই যে ধর্ম্মের দ্বেষক অসুরেরদিগের কুৎসিত রূপে ভক্ষণ করিলা এসকল তোমাভিন্ন আর কে করিতে পারে। তথা বিবেকের প্রদীপ রূপ ব্রহ্মবিদ্যাতে ও ইন্দ্রজালাদি বিদ্যাতে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রেতে ও বেদেতে তোমাভিন্ন কে আর আছে। এই সকল শাস্ত্রে তোমাভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। তথা মমত্ব রূপ গর্ত্তে অতি মহা অন্ধকারে তুমি সকল লোক্কে ঘুরাইতেছ। তথা যে স্থানে রাক্ষস ও যে স্থানে উগ্রবিষ ও যে স্থানে সর্প ও হস্তী ও যে স্থানে শত্রু ও যে স্থানে শত্রুসৈন্য ও যে স্থানে দাবানল। ও যে স্থানে সমুদ্র সেই ২ স্থানে থাকিয়া তুমি বিশ্ব রক্ষা কর। হে দেবি তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী অতএব বিশ্ব রক্ষা কর। তুমি বিশ্বরূপা অতএব বিশ্ব ধারন করিতেছ তুমি বিশ্বেশবন্দ্যা তোমাতে ভক্তিতে নম্রা যে সে বিশ্বের আশ্রয় হে দেবি তুমি প্রসন্না হও

আর শত্রুর ভয় হইতে বিশ্ব রক্ষা কর ।০।০।০। [পৃ:২৯] যেমন অসুর বধ করিয়া আমাদিক্কে রক্ষা করিলা। আর তেমত জগতের পাপ শীঘ্র নাশ কর আর উৎপাতে জাত যে মহা উপসর্গ তাহাও নাশ কর। হে দেবি হে বিশ্বার্তিহারিনি প্রণত লোকেদিক্কে প্রসন্ন হও। তোমাকে প্রণাম করি তুমি ত্রৈলোক্যবাসি লোকেদিক্কে প্রসন্ন হও ।। পরে দেবি কহিতেছেন হে দেবগণ আমার নাম বরদা অতএব জগতের উপকারের নিমিত্তে যে বর ইচ্ছা কর তাহা চাহ আমি দেই। পরে দেবতারা দেবীকে কহিতেছেন হে অখিলেশ্বরী সর্ব্বজগতের সকল বাধা নাশ আর আমারদিগের শত্রুনাশ এইরূপে করিবা ।০।। পরে দেবী কহিতেছেন বৈবস্বত নমে সপ্তম মনুর অষ্টাবিংশতি যুগে শুম্ভ নিশুম্ভ নামে আর দুই অসুর হইবেক আমি নন্দঘোষের ঘরে যশোদার গর্ভে জন্মিয়া তাহাদিকে নষ্ট করিয়া বিন্ধ পর্ব্বতে থাকিব আমার নাম বিন্ধবাসিনী হইবেক। পুনর্ব্বার আমি অতি ভয়ানক রূপেতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বৈপ্রচিত্ত নামে অনেক দানব নষ্ট করিব। সেইবৎ দানবদিক্কে আমি খাইব। ও আমার দন্তসকল দাড়িম ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবেক। অতএব আমাকে স্বর্গে দেবতারা মর্ত্যলোকে মনুষ্যেরা রক্তদন্তিকা বলিয়া কহিবেক। পরে যে কালে একশত বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইবেক ও পৃথিবীতে জল থাকিবেক না সেই কালে সকল মুনিরা আমার স্তব করিবেক আমি অযোনিজা হইয়া একশত নেত্রেতে মুনিদিক্কে দেখিব ও আমাকে মনুষ্যেরা শতাক্ষী বলিয়া কহিবেক। তৎপরে আমার দেহ সমুদ্ভব শাকেতে যতদিবস পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হয় সেই পর্য্যন্ত আমি লোকেদিক্কে প্রতিপালন করিব। সেই শাক লোকের প্রাণধারক হইবেন। ও পৃথিবীতে আমার নাম শাকম্ভরী হইবেক। সেই কালে আমি দুর্গম নামে মহাসুরকে বধ করিব ও আমাকে লোকে দুর্গাদেবী বলিয়া কহিবেক। পুনর্ব্বা [র] ও রাক্ষস সকল নষ্ট করিব। সেই কালে মুনি সকল নম্র মস্তক করিয়া আমাকে স্তব করিবেক ও আমার নাম ভীমাদেবী বলিয়া রাখিবেক। ও যে কালে অরুণাখ্য অসুর ত্রৈলোক্যের মহা বাধা করিবেক ও সেই কালে সকলের হিতের নিমিত্তে ভ্রমরের রূপ ধারন করিয়া তাহার বধ করিব ও আমাকে ভ্রামরী বলিয়া লোকে বলিবেক ও স্তব করিবেক। এই প্রকারেতে যে কালে ২ দানবেরা লোকের পীড়া দিবেক সেই ২ কালে আমি অবতীর্ণ হইয়া সকল শত্রু নষ্ট করিব ।।০।। মেধস মুনির সহিত সুরথরাজার কথোপকথনে ভগবতীর স্তব ।।০।।০।।০।। পুনর্ব্বার দেবী কহিতেছেন [পৃ:৩০] এই স্তবেতে যে মানুষ আমার স্তব করিবেক তাহার সকল বাধা আমি নষ্ট করিব। ইহার সন্দেহ নাই। তথা মধুকৈটভের নাশ ও মহিষাসুরের নাশ ও শুম্ভনিশুম্ভের বধ যে কীর্ত্তন করিবে তাহার মঙ্গল করিব। তথা অষ্টমীতে ও চতুর্দ্দশীতে ও নবমীতে

একমনা হইয়া যে আমার মাহাত্ম্য শুনিবে তাহার পাপ ও আপদ থাকিবেক না। তথা তাহার দারিদ্র ও পুত্রাদি বিয়োগ ও শত্রু হইতে ভয় ও রাজা হইতে ভয় ও শস্ত্র হইতে ভয় ও অনল হইতে ভয় ও জলে ভয় কখন হইবেক না। অতএব আমার মাহাত্ম্য পড়া কর্ত্তব্য ওশ্রোতব্য। আমার মাহাত্ম্য পরম স্বস্ত্যয়ন ও আমার মাহাত্ম্য শ্রবণেতে মহামারী উদ্ভব অশেষ উপসর্গ আর ত্রিবিধ উৎপাত নষ্ট হয়। আর আমার মাহাত্ম্য যে গৃহে পাঠ করে সে গৃহ আমি কখন ত্যাগ করিনা। তথা বলিদানে ও পূজাতে ও হোমে ও মহোৎসবে এই আমার মাহাত্ম্য শ্রোতব্য ও পঠিতব্য। জ্ঞানত কিম্বা অজ্ঞানত বলিদান কিম্বা পূজা ও হোম করিয়া আমার মাহাত্ম্য পাঠ করে যদি তবে তাহার সকল পূর্ণ হয়॥ তথা শরৎকালে বার্ষিক যে দুর্গাপূজা তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি যুক্ত হইয়া আমার মাহাত্ম্য যে মনুষ্য সোনে সে সকল বাধা বিমুক্ত হইয়া ও ধনধান্যেতে ও সুতেতে অন্বিত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। আর যে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তাহার সুন্দর কুলে উৎপত্তি হয়। ও যুদ্ধে পরাক্রম হয় ও নির্ভয় হয় ও তাহার শত্রু নষ্ট হয় ও তাহার কল্যাণ হয় ও তাহার বংশ আনন্দিত হয়॥ তথা শান্তিকর্ম্মে ও দুঃসপ্ন দর্শনে ও গ্রহপীড়াতে আমার মাহাত্ম্য যদি শ্রবণ করে তাহার উপসর্গ নষ্ট হয় ও গ্রহপীড়া জায় ও দুঃসপ্ন সুসপ্ন হয়। আর বালগ্রহেতে অভিভূত যে বালক তাহারদিগের শান্তিকারক আত্মীয় লোকের সহিত বিবাদ হইলে আমার মাহাত্ম্য যদি পড়ে তবে পুনর্ব্বার আত্মীয়তা হয়॥ ও আমার মাহাত্ম্য যে স্থানে পাঠ করে সে স্থানে আমি সর্ব্বদা থাকি॥ আর তাহারদিগের শত্রুর বল ক্ষয় হয় আর রাক্ষসের ও ভূতের ও পিশাচের ভয় নাশ হয়॥ ও বলি দানেতে ও পুষ্পেতে ও অর্ঘেতে ও ধূপেতে ও গন্ধেতে ও উত্তম দীপেতে ও ব্রাহ্মণ ভোজনেতে ও হোমেতে ও দিবারাত্রি হর্বিদানেতে ও অন্য আর ২ নানা প্রকার ভোজনীয় সামগ্রী দানেতে একবৎসর পর্য্যন্ত আমার পূজা করিলে যে প্রীতি আমার হয় সেই প্রীতি আমার হয় যদি একবার আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে॥ ও আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয় ও আরোগ্য হয়। আর আমার জন্মকথার কীর্ত্তন করিলে ভূত হইতে রক্ষা পায়॥ ও যুদ্ধেতে আমার যে দুষ্ট দৈত্য নিবর্হন চরিত্র তাহা শ্রবণ করিলে পুরুষের শত্রুকৃত ভয় হয় না।০।০। [পৃ:৩১] আমার যে স্তব তোমরা করিয়াছ ও আর যে স্তব ব্রহ্মর্ষিরা করিয়াছে ও আর যে স্তব ব্রহ্মা করিয়াছেন সেই সকল তোমারদিগের সুন্দর মতি করুক। তথা অরণ্যে কিম্বা দূরশূন্য পথে যদি কেহ বনাগ্নিতে পরিবারিত হইয়া তথা ত্রিবান্তরে চৌরতে কিম্বা শত্রুতে গৃহীত হইয়া তথা বনে সিংহতে কিম্বা ব্যাঘ্রেতে কিম্বা বনহস্তিতে যদি প্রাপ্ত হইয়া তথা ক্রোধযুক্ত রাজা কর্তৃক বধ্য হইয়া কিম্বা কারাগারে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া তথা

সমুদ্রে নৌকায় মহাবাতাসে ঘুর্নিত হইয়া তথা যুদ্ধে দারুন অস্ত্রের সম্মুখে পড়িয়া তথা আর ২ সকল ভয়দায়ক বাধাতে পড়িয়া তথা বেদনাতে পীড়িত হইয়া মনুষ্য যদি আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তবে সঙ্কট হইতে মুক্ত হয় আমার চরিত্র যে স্মরণ করে তাহারদিগের নিকট হইতে সিংহাদি ও চোরেরাও শত্রুরা দূরে পালায় ।।০।। পরে মেধস মুনি কহিতেছেন সুরথরাজাকে ।।০।। ভগবতী চন্ডিকা এই কথা কহিয়া দেখিতেছিলেন যে দেবতারা তাঁহারদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। পরে সেই সকল দেবতারা শঙ্কারহিত হইয়া ও পূর্ব্বের মত আপন ২ অধিকার শাসন করিতে লাগিলেন। এবং আপন ২ যজ্ঞভাগ ভোজন করিতে লাগিলেন ।। তথা জগতের ধ্বংসকারি ও অতুল বিক্রম ও মহাপ্রতাপান্বিত ও মহাবল সেই শুম্ভ আর নিশুম্ভ যুদ্ধে ভগবতী কর্তৃক নিহত হইলে শেষ যত অসুর ছিল তাহারা পাতালে পালাইয়া গেলো। সেই যে ভগবতী নিত্যা দেবী তিনি এই প্রকারে সম্ভূতা হইয়া হে মহারাজ জগতের প্রতিপালন করেন ।। ও সেই দেবী এই জগত মোহিত করেন ও জগত প্রসবো করেন। তথা সেই দেবী যাচিতা হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান দেন ও তুষ্টা হইয়া সম্পত্তি দান করেন হে মহারাজ সেই দেবী এই সকল ব্রহ্মান্ড ব্যাপিয়া আছেন ।। সেই যে মহাকালী তিনি মহাপ্রলয় সময়ে মহামারি স্বরূপা। সেই নিত্যা যে মহামারীরূপা তিনিই জগতের আরম্ভ কালে সৃষ্টি স্বরূপা ।।০।। পুনর্ব্বার সেই নিত্যা দেবী সম্পতকালে গৃহে বুদ্ধিদায়িকা লক্ষ্মী। সেই দেবী বিপত্তি কালে অলক্ষ্মী হইয়া সকল নাশের নিমিত্ত হন ।। সেই দেবী স্তুতা যদি হন আর পুষ্পেতে ও গন্ধাদিতে পূজিতা যদি হন তবে পুত্র ও ধর্ম্ম ও সুন্দর মতি দেন ।।০।। সুরথমেধসি সম্বাদে এই পর্য্যন্ত শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সমাপন। পুনর্বার মেধস মুনি সুরথ রাজাকে কহিতেছেন। হে মহারাজ এই সকল দেবী মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। যে দেবী এই জগৎ ধারণ করিতেছেন তাঁহার এইরূপ প্রভাব যে বিষ্ণুমায়া কর্তৃক সুরথ যে তুমি সম্প্রতি মোহযুক্ত হইতেছ [পৃ:৩২] আর সমাধি নামে যে এই বৈশ্য তথা অন্য আর ২ যে বিবেকিরা সংপ্রতি মোহযুক্ত হইতেছে আর পূর্বের যাহারা মোহযুক্ত হইয়াছে আর পরে অপর যাহারা মোহ যুক্ত হইবে সেই দেবী সকলের অজ্ঞানোপায় করেন। হে সুরথ মহারাজ সেই দেবীর চরণদ্বয় শরণাপন্নই করিয়া পাও তিনি আরাধিতা হইলে মনুষ্যেরদিগের ভোগ ও স্বর্গ ও মুক্তি দেন ।। পরে মার্কন্ডেয় মুনি ভাগুরী মুনিকে হিতেছেন হে ভাগুরে মেধস মুনির এই সকল বাক্য সুরথ রাজা সুনিয়া সেই মুনিকে প্রণাম করিয়া মমত্বেতে আর রাজ্যের অপহরণেতে দুঃখী হইয়া সেই সমাধী নামে বৈশ্যের সহিত তপস্যা করিতে চলিল ।। হে মহামুনে হে ভাগুরে ভগবতী মা এর সন্দর্শনের নিমিত্ত

নদীর তীরে বসিয়া দেবীর উৎকৃষ্ট মন্ত্র জপ করতো সেই বৈশ্য সেই রাজা তপস্যা করিতে লাগিল ।। পরে সেই দুইজন নদীতীরে মৃত্তিকার দুর্গা প্রতিমা করিয়া পুষ্পেতে ধূপেতে হোমেতে ভগবতীর পূজা করিল। ও কোন দিবস আহার রহিত ও কোন দিবস হবিষ্য আহার হইয়া সাবধান হইয়া দেবীর প্রতি মনোযোগ করিয়া আপন ২ গাত্রের ব্যাধির বলিদান করিয়াছিল ।। এই রূপে যতাত্মা হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আরাধনা করিতেছিল যে সুরথ আর বৈশ্য তাহাদিক্কে তুষ্টা হইয়া প্রত্যক্ষে আসিয়া চন্ডিকা কহিলেন। হে ভূপ তুমি আমা হইতে যাহা প্রার্থনা কর হে কুলনন্দন বৈশ্য তুমিও যাহা আমা হইতে প্রার্থনা কর তাহা আমি দেই আমি তোমাদিক্কে তুষ্ট হইয়াছি ।। পরে মার্কন্ডেয় মুনি ভাগুরী মুনিকে কহিতেছেন। পরে সুরথরাজা বর চাহিল যে আমার জন্মান্তরে এমত রাজ্য হয় যে তাহা আর কেহ লইতে না পারে। আর এই জন্মে আমার আপন বলেতে শত্রু নষ্ট করিয়া নিজ রাজ্য হয় ।। পরে সেই পন্ডিত যে বৈশ্য অবিবিক্ত চিত্ত হইয়া জ্ঞান যাচিঞা করিল। যে আমার এই ও আমি এই এই রূপ যে মায়াসঙ্গ না থাকে এমত যে ব্রহ্মজ্ঞান আমার হউক। পরে দেবী কহিলেন হে মহারাজ অল্পদিনের মধ্যে নিজ রাজ্য পাইবা ও তোমার শত্রু নষ্ট করিয়া রাজা হইবা। আর তুমি মরিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্য হইতে জন্ম পাইয়া পৃথিবীতে সাবার্ণক নামে অষ্টম মনু হইবা। হে বৈশ্য তুমিও যে আমার স্থানে বর যাচিঞা করিলা তাহা আমি তোমাকে দিলাম তোমার উত্তম জ্ঞান হইবেক। পরে মার্কন্ডেয় মুনি ভাগুরী মুনিকে কহিলেন এই যথাভিলাসিত বর সুরথ রাজাকে আর সমাধি নামে বৈশ্যকে ভগবতী দিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুইজন কর্তৃক স্তুতা হইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই প্রকারে দেবী হইতে বরলাভ করিয়া শত্রু নষ্ট করিয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া মরনন্তরে সূর্য্য হইতে জন্ম পাইয়া সাবর্ণক নামে অষ্টম [পৃ:৩৩] মনু হইয়াছে ।। এই সুরথ মেধসীয় সম্বাদ সমাপন হইল। এই কথা পক্ষিরা জৈমিনি মুনিকে কহিল পরে জৈমিনি মুনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।।

—০—

TRANSLATION

OF

The Substance of the Work called chŭndēē

A khŭndŭ of Markŭndayu Pooranŭ

[Reprinted from "Account of the Writings, Religious and Manners of the Hindoos-including Translations from their Principal Works; in four Volumes, by W. Ward, Vol. 2.; Serampore, Printed at the Mission Press, 1811." Page 177 to 188.]

The Chŭndēē is a work read by many of the Bengal pŭndits and especially by the worshippers of the goddess kalēē, and of the other goddesses to whom bloody sacrifices are offered . A great number of bramhŭns may be seen in the porches of the temple at Kalēē-ghatŭ, near Calcutta, reading this book. These mild, gentle, and venerable bramhuns seem to enjoy a peculiar pleasure while beholding Kalēē, as exhibited in this work, craunching the bones, drinking the blood, and feeding on the dead bodies of her enemies.

Joiminee, a moonee, went to Markŭndāyŭ, another moonee, and said, - "O moonee! I am come to be taught religion by you; become my teacher, and relate to me the story of king Soorŭthŭ and Mādhŭsŭ, a moonee." Markŭndāyŭ told him that he was now engaged in his tupusya, but that he had told this story to four birds, who would give him all the particulars, and he therefore recommended him go go to them.

Joiminee then went to these birds, who gave him the following account : Chaya, the wife of Sōōryŭ, had a son named Savurnnee, who received the name of the seventh mŭnoo.

In the time of the second mŭnoo, a race of kings existed called choitru, from whom arose soorŭt'hŭ, a very holy king, who cherished his subjects like his children. He was an universal monarch; but on a certain occasion a barbarous people, eaters of swine's flesh, invaded his dominions, and took them, leaving to the king only his principal city. After some time these enemies made friends with the king's ministers, and drove him from his capital.

Seeing the deceitfulness of his ministers, and the uncertainty of all human things, the king became vexed with the world, and

retired into a forest. After wandering in the forest for a long time, he at length approached the ashrŭyŭ of a moonee named Mādhŭsŭ, where he saw tygers, bears, and all manner of savage beasts, playing in the most innocent manner, neither hurting one another, nor the moonees, who were chanting the vādŭs in the ashrŭyŭ.

soorŭt'hŭ went into the hut of the moonee, who received him with the greatest politeness, and paid him the highest honours.

After staying some time, the king went out one day, and began to be overwhelmed with sorrow, and worldly thoughts about his kingdom wife, children, army, &c. While the king was thus wandering about, mourning over the loss of a world, he met a stranger, whom he asked respecting his cast, friends, &c. The stranger said, he was of the voishyŭ cast; that his relations were rich; that his name was Sumadhee; that his wife and friends had turned him out of doors; yet, notwithstanding their behaviour, he said he was very anxious after their welfare. The king wondered that he should still feel for those who had used him so ill. Sŭmadhee said, it was true, it might appear strange, but yet he could not help it.

Sŭmadhee then asked the king, who he was ? The king told him, that he had been such a king, and that his enemies and his own servants had treated him in such and such a manner.

A very strong attachment took place betwixt the king and this voishyŭ, in consequence of the similarity of their sufferings; and they began to consult how they might recover what they had lost in the world.

They resolved to go to the moonee Mādhŭsŭ, and to ask him to point out to them a remedy for their case.

They went - and related their condition and feelings to Mādhŭsŭ, asking him to make known to them the reason of their having such feelings towards those who had ruined them. The moonee, illustrated this by example of a young bird, who leaves its nest and the old ones, without the least thought of, or concern for those who had nourished it : yet the old birds, for a long time, think with uneasiness about their wandering young one. The moonee, from this and other examples, shewed them, that this is universal among

all creatures, and that this feeling is called Mŭha-maya.[1]

These two guests enquire of the moonee who this Mŭha-maya is? The moonee declares that this Muha-maya is the being who creates, preserves and destroys ; and, except whom, there is none else.[2]

These two persons ask to be informed more particularly respecting this being, whose name is Mŭha-maya. The moonee said, notwithstanding she is unchangable, yet I will inform you of her birth.

" When the earth was immersed in the waters,[3] Mŭha-maya, assuming the form of sleep, caused a heavy sleep to fall even on Vishnoo. While he slept, two ŭsoorŭs were born from the dirt of his ears, who went to the heaven of Brumha, with the resolution of devouring this creator of the world. Brŭmha, frightened beyond measure, fled and all the gods with him! What was to be done? Vishnoo, the great god, was asleep : No help could be had from him therefore. It was at last resolved, that they should apply to Mŭha-maya, who had sent Vishnoo to sleep.

"The gods now go to Mŭha-maya, and pay the greatest degree of stŭvŭ to her, with which she is so pleased, that she arises from Vishnoo's eyes, and leaves the god to awake. Being awake, the gods offer the greatest flatteries to him, when Vishnoo asks them for what they a come, and promises them his blessing. They acquaint him with the atrocities of two ŭsoorŭs, who had been born from the dirt of his ears, and pray for his protection. Vishnoo promises to destroy them.

" This great god then began to fight them with his fists in the air and this warfare was continued for 5000 years, without success on either side.

" The ŭsoorŭs were highly pleased that Vishnoo was unable to subdue them; and, in pride, told Vishnoo to ask a blessing at their

1. *Viz. Delusion, or, more particularly, that attachment to earthly things, which makes the person regard the world as the chief good, and which binds the soul to the earth.*

2. *Mind, matter, qualities–every thing, according to the metaphysics of the Hindoos, is God.*

3. *At the Hindoo deluge.*

hands. At hearing this, Vishnoo also was pleased, and asked of them this blessing, that by his hands they might be conquered. They promised the blessing, on condition that he would not destroy them in water.[4]

"Vishnoo, after reflecting for a short time, promised them, that he would keep this condition. He then, stretching out his arms, placed them on his left arm, and destroyed them.

"The gods pay the greatest stŭvŭ to Mŭha-maya, and to Vishnoo, when the former invites them to come to her whenever they get into trouble, and promises that she will deliver them."

"Having finished this relations, Mādhŭsŭ tells his two guests, that this is one story of Mŭha-maya: he then invites them hear another:

"Muhishasoorŭ, the king of the usoorŭs, at a certain period, became so oppressive that he overcame the gods, disinherited them, recuded them to beggary, and they were seen in a forlorn state, wandering about the earth like common beggars.

"Indrŭ, after a time, collected them together, and they went in a body to Brŭmha, who said he could do nothing for them. They next go to Shivŭ, and meet with the same success. At last they proceed to Vishnoo, and tell him their woeful tale, who was enraged to a dreadful degree, when streams of glory proceeded from the face of Vishnoo and Shivŭ, from which sprung a female whose name became Mŭha-maya. Streams of glory from the faces of the rest of the gods followed, and entering the body of this female, she became a body of a glory resembling a mountain.

"All the gods then gave their weapons to this female, and, with a dreadful cry, she ascended into the air. Mŭhishasoorŭ hears the noise, and reflects within himself, who, in the three worlds, dared to make such a noise. He then arose, and resolved upon the destruction of this person, whoever he might be.

[This work, in this place, contains a long account of the dreadful contest which took place, betwixt Mŭha-maya and this ŭsoorŭ, which ended in the destruction of the latter.]

4. The earth was then covered with water.

"The gods present much stŭvŭ to Mŭha-maya on account of the destruction of this king of the ŭsoorŭs. The goddess, pleased with their stŭvŭ, promised to help them whenever they were in distress, and then disappeared."

Mādhŭsŭ next tells his guests another story:

"Shoombhŭ and Nishoombhŭ, two dreadful ŭsoorŭs, oppressed the earth, and even overcame the gods, taking away their power, and reducing them to beggary.

"In their degradation they petition Bhŭgŭvŭtēē, i.e. Muha-maya, who gives them a bleassing, and disappears. Before their departure, the gooddess, arrayed like a female, passes the assembled gods to fetch water. This female asks them whose praise they are chanting? While she utters these words, a goddess springs from her body, and replies- "They are celebrating my praise." Bhŭgŭvŭtēē, the female, with the new goddess, then ascends the mountain Himalŭyŭ, and disappears.

"Upon this mountain Shoombhŭ and Nishoombhŭ had two messengers, named Chundu and Mundu. As these two messengers wandered up and down on the mountain, they one day saw the new goddess, and were overcome by her beauty, which they report to the ŭsoorŭs, their masters; and recommend to them to procure this female even if they give all the glorious things which they had obtained in plundering all the heavens of the gods. Shoombhŭ sends a messenger named Shoogrēēvŭ to this goddess, to tell her that all the riches of the three worlds were in his palace, and that all the offerings which used to be presented to the gods were now offered to him; that all these riches, offerings, & c. should be her's, if she would come to him. The goddess replied that these words were very good; but she had resolved, that the person whom she married must first conquer her in war, and destroy her pride; Shoogrēēvŭ was very angry, and requested a favourable answer to the request of his master; after which he himself would engage to conquer her in war, and subdue her pride. Did she know his master, before whom none of the inhabitants of the three worlds could

stand, whether nagŭs, men, or gods ? How then could she, a female, think of standing before him? If his master Shoombhŭ had ordered him, he would compel her to go into his presence immediately. She said all this was very just, but she had made her resolution, and she exhorted him, therefore, to go and tell his master to come and try his strength with her.

"The messenger then goes to his master, and relates to him what he had heard from this female. Shoombhŭ was filled with rage, and, without making any reply, called for Dhōōmlōchŭnŭ, his commander in chief, and gave him orders to go to the mountain Himalŭyŭ, and sieze a certain goddess (giving him particular directions), ordering him to seize the goddess by the hair, and bring her to him, and if any one attempted to rescue her, utterly to destroy them.

"The commander goes to Himalŭyŭ, and acquaints the goddess with his master's orders. The goddess smiles, and tells him to execute his master's orders.

"The commander then goes to seize the goddess, when she set up a dreadful roar, as is usual among the Hindoo warriors when two combatants meet, by which this commander in chief was reduced to ashes; afterwards the army of this ŭsoorŭ was destroyed by this goddess and the lion on which she rode. The remnant that escaped communicated the tidings.

"The two ŭsoorŭs, Shoombhŭ and Nishoombhŭ, were filled with wrath at hearing these tidinds, and sent two other commanders, Chŭndŭ and Mŭndŭ, to fetch the goddess by the hair of her head. They depart, and, on ascending the mountain, perceive a female sitting on an ass, and laughing; but on seeing them she was full of rage, and drew to her ten, twenty, or thirty of their army at a time, and devoured them like fruit, dringking their blood. Next, she seized Mŭndŭ by the hair, cut off his head, and, holding it over her mouth, drank the blood. Chŭndŭ, on seeing the blood of the other commander devoured in this manner, was filled with fury, and, with his army, came to close quarters with the goddess; but she, mounted on the lion, sprang on him, and did to him as she had done to

Mŭndŭ. She devoured part of the army, and drank the blood of the rest.

A few fugitives eacaped to the two ŭsoorŭs, who, on receiving the news of this dreadful defeat, revolved to go themselves and engage the furious goddess. They collected their whole forces, an infinite number of ŭsoorŭs, and marched to Himalŭyŭ.

The gods looked down with astonishment at this army of usoorus, and all the goddesses deseended to help Muha-maya (Kalee), who soon destroyed the army under the principal commander, named Ruktuveeju. This officer, seeing all his men destroyed, encountered the goddess in person. The goddess wounded him, but from every drop of blood, as soon as it fell to the ground, there arose a thousand heroes equal in strength to Rŭktŭvēējŭ;[5] hence innumerable enemies surrounded Mŭha-maya.

The gods were alarmed at this amazing sight. At length Chŭndēē, a goddess, who was assisting Kalēē in the engagament, promised the latter, that if she would open her mouth, and drink his blood before it fell on the ground, she would engage the ŭssoorŭ, and destrory all the ŭsoorŭs who had arisen from the drops of Rŭktŭvēējŭ's blood. Kalēē consented, and this commander was thus soon destroyed.

Shoombhŭ and Nishoombhŭ, in a state of desperation, next engaged the goddess, Shoombhŭ going into the engagament first. The battle was dreadful, inconceivably dreadful, on both sides, till at last both the usoorus were killed, and Kalēē sat down to feed on the carnage she had made.

The gods and goddesses then began to pay stŭvŭ to Mŭha-maya, who granted a blessing to each. After the destruction of these enemies of the gods, the sun (Sōōryŭ) shone resplendent; the wind (Vayoo) blew salubriously ; the air became pure ; and mankind were fixed in happiness ; the moonees, delivered from fear, performed their tŭpŭsya without interruption; all the people were able to attend to the ceremonies of their religon ; the gods were instated in their honours, and the inhabitants of patalŭ attended, without fear, to the duties of their religion.

5. This arose from a blessing given by Brumha.

।। উল্লেখ সূচী ।।

১। Sen, Dinesh Chandra : History of Bengali Language and Litarature, P 225 - 235.
ড: সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যর ইতিহাস, প্রথম খন্ড, অপরার্ধ, পৃ: ৩১৪-১৫

২। Second Report Relative to Serampore College, pp 17 - 18.

৩। দেবান্তসার, ঢোমদম্ম ওড়. চ. ২˙২৪, সুরথমেধসীয় সম্বাদ, ঢোম্মদম্ম ওড়. চ. ৩˙৪, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ও কালিকা পুরাণ, ঢোম্মদম্ম ওড়. চ. ২˙৫১, পুঁথি সংগ্রহ,কেরী লাইব্রেরী।

৪। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি-বেদান্তসার", কাউন্সিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮৪।

৫। "মার্কন্ডেয় পুরাণম্" ঃ আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিসার্শ পৃ: ৩।

৬। Winternitz, M, : A History of Indian Literature", Vol I, 1927. PP. 559 & 565.

৭। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ : শ্রী শ্রী চন্ডী, উদ্বোধন কার্য্যালয় কলিকাতা, ভূমিকা, পৃ: ২৫।

৮। সাধনসমর বা দেবীমাহাত্ম, ১ম খন্ড, ৪র্থ সং উদ্বোধন, ব্রহ্মর্ষি শ্রী শ্রী সত্যদেব, ভূমিকা

৯। Periodical Accounts Relating to the Baptist Missionary Society, Vol. II, p 233.

১০। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসার" কাউন্সিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮৪, পৃ: ১৩।

১১। Ward, W : Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos, Vol II, Mission Press, Serampore, 1811. Page 177.

১২। Winternitz, M : A History of Indian Literature, Vol- I, 1927, p. 565.

১৩। Ward, W. : Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos, Vol. II, 1811, p. 189.

১৪। Das, Sisir : Early Bengali Prose ঃ Carey to Vidyasagar, p. 106.

১৫। ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত , পঞ্চম খন্ড পৃ: ৮৭৫, ৯০৯.

১৬। Colebrook. H. T : Miscellaneous Essays, Vol I, 1837, p. 336.

১৭। ড: সুকুমার সেন ঃ বাংলা সাহিত্যে গদ্য, চতুর্থ সং, পৃ: ১৮

১৮। উইলিয়াম কেরী : মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত, ১৮০০, পর্ব ৯, ১-৮ (পৃষ্ঠাগুলি সংখ্যাচিহ্নিত নয়)।

১৯। শ্রী শ্রী বৃন্দাবনলীলা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুঁথি, নং ৯২৮।

শ্রী ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় ঃ বাংলা গদ্যের অদিপর্ব, পৃ: ১০৭ থেকে উদ্ধৃত।

২০। ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ১ম খন্ড, পৃ: ৬ - ৭।

২১। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ", রঞ্জন পাবলিশিং হাউস পৃ: ২১০-১১।

২২। কথকতা। রামায়ন, শিবরতন মিত্র সংগৃহীত পুঁথি। শ্রী ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের আদিপর্ব, পৃ: ১১৫।

২৩। ঐ, পৃ: ১৭৯

২৪। ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন", প্রথম খন্ড, পৃ: ১৩৩।

২৫। Das, Sisir, "Early Bengali Prose - Carey to Vidyasagar", pp. 82-101.

২৬। ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন, প্রথম খন্ড, পৃ : ৬৪।

২৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম খন্ড রামরাম বসু পৃ : ৩৭।

২৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৬, "বেদান্তচন্দ্রিকা", পৃ : ২১৩।

২৯। ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, প্রথম খন্ড, "বত্রিশ সিংহাসন", পৃ: ২৫৮।

৩০। শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি : বেদান্তসার", কাউন্সিল অফ্ শ্রীরামপুর কলেজ, ১৯৮৪, পৃ: ২৪।

৩১। ড: অসিত সুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ "পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন" প্রথম খন্ড, শৈব্যা পুস্তকালয়, ১৯৭৮, "বত্রিশ সিংহাসন," পৃ : ২৩২

৩২। Sen, Dinesh Chandra : History of Bengali Language and Literature, pp. 229-30 .